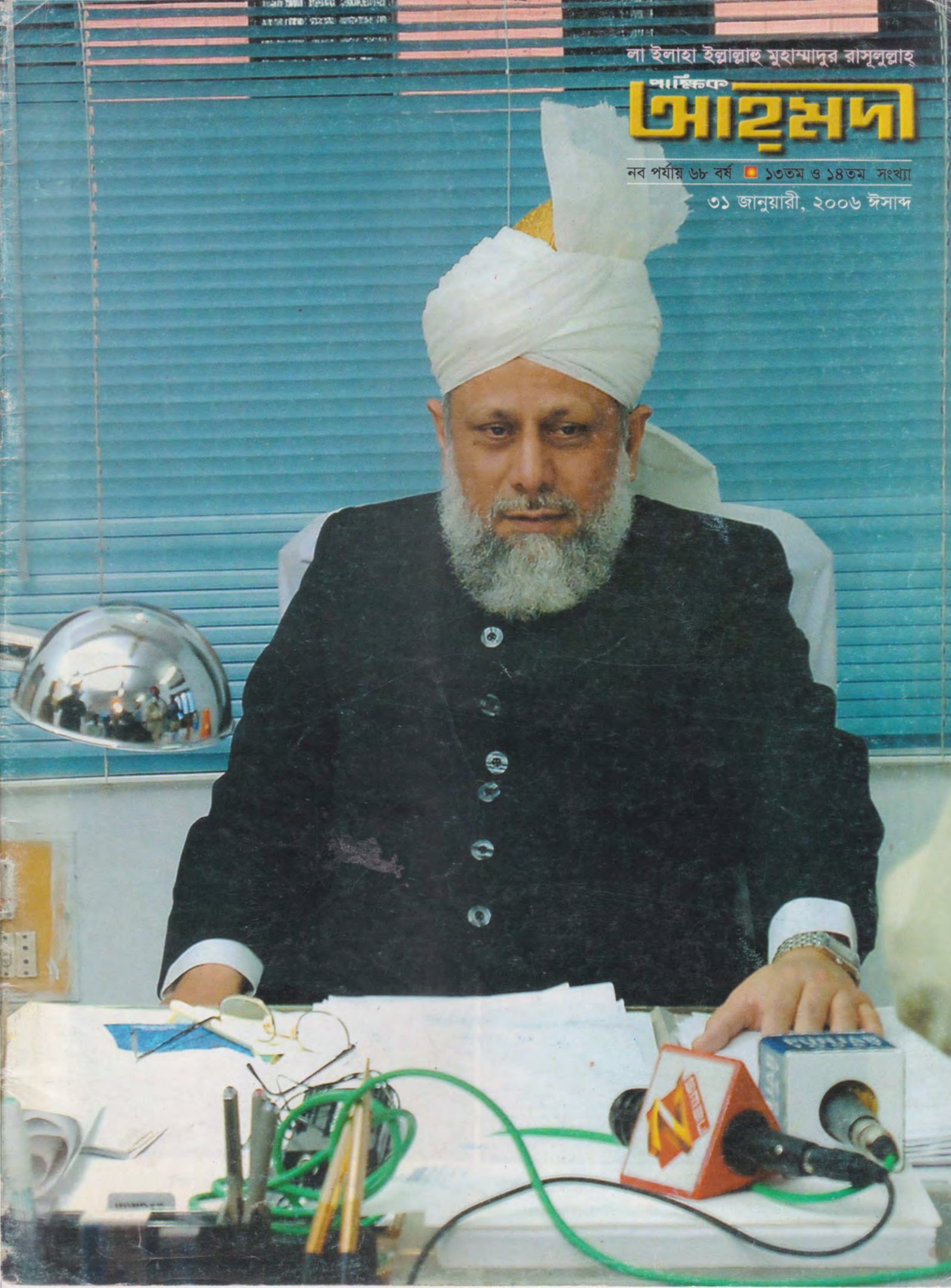

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৮ বর্ষ ■ ১৩তম ও ১৪তম সংখ্যা

৩১ জানুয়ারী, ২০০৬ ঈসাব্দ

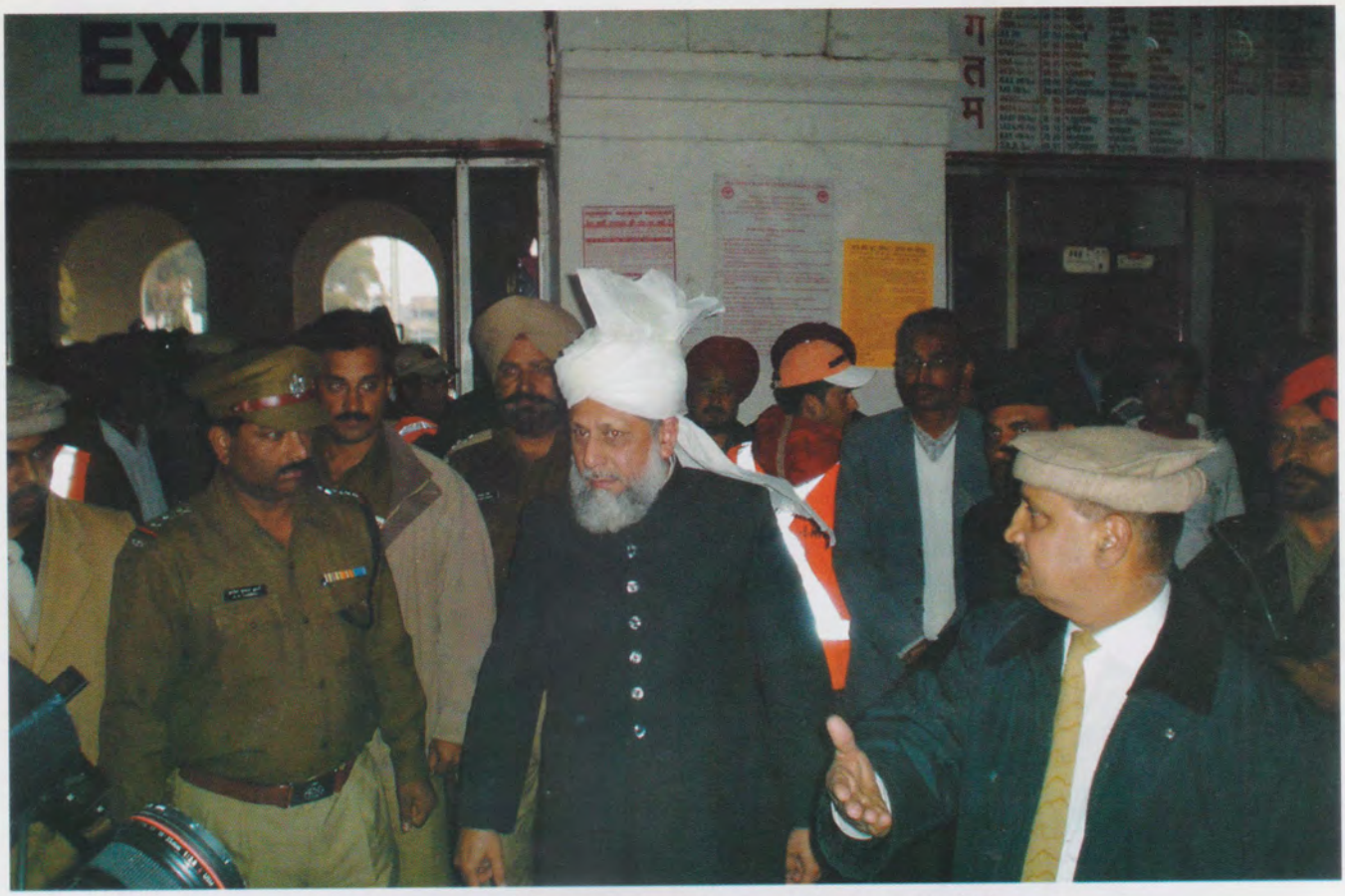

কাদিয়ান থেকে দিল্লীর পথে অমৃতশর রেলওয়ে ষ্টেশনে হুযূর (আইঃ)

আহমদীয়া মুসলিম জামাত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নূর হাসপাতাল, কাদিয়ান

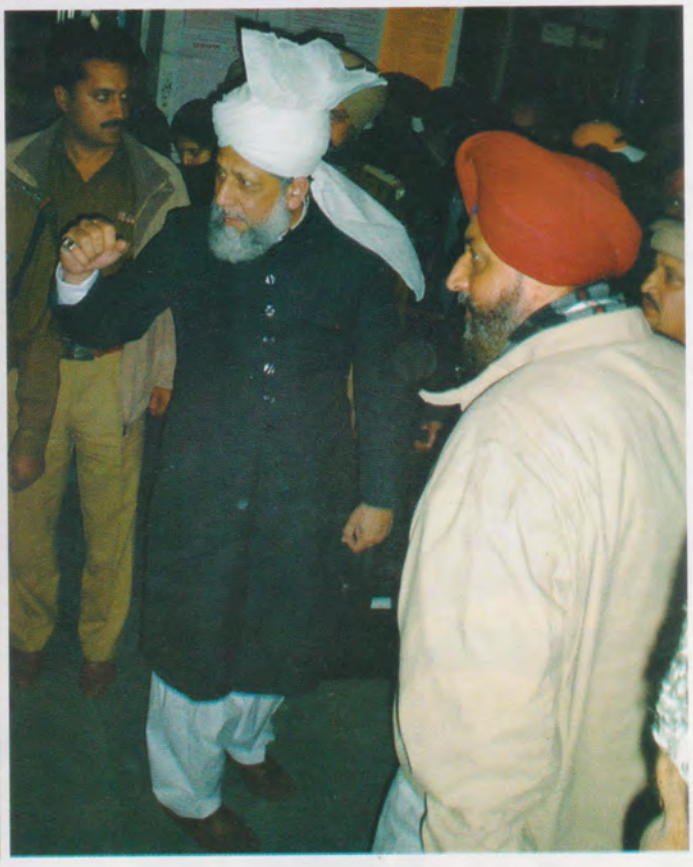

অমৃতশর রেলওয়ে ষ্টেশনে হুযূর (আইঃ)

সম্পাদকীয়

জলসা সালানার গুরুত্ব

বিশ্বে আজ চরম অশান্তি। এর প্রতিটি ক্ষেত্র অবক্ষয়ে আক্রান্ত। মানুষগুলো দিশেহারা হয়ে খুঁজছে এ থেকে মুক্তির পথ। অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্মনীতি; কোন নীতিই আজ মনুষকে সঠিক পথ দেখাতে পারছে না। তারা একটা অন্ধকার থেকে মুক্তি পেতে গিয়ে মনের অজান্তেই আরেকটি অন্ধকারে পা বাড়াচ্ছে। এ কারণেই মানুষ খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের মানসে না জেনে না বুঝে খোদার ক্রোধ উদ্রেককারী কর্ম নিরীহ মানুষ হত্যার মত জঘন্য কাজ করে যাচ্ছে নির্বিচারে, নির্দ্বিধায়।

মানুষের চিন্তা-চেতনা ও কর্মে এই যে অবক্ষয়, এ থেকে মানুষকে মুক্ত করে, সিরাতাল মুস্তাকীমের পথ আজ একমাত্র কুরআন মজীদের সঠিক শিক্ষা ও আদর্শই দেখাতে পারে। আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে এমনই এক অন্ধকার যুগে আলোর প্রভা দেখিয়েছেন এই কুরআন ও এর মহান বাহক হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ)। আজও এ অন্ধকার যুগে আলোর পথ দেখানোর জন্য হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ)-এর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কুরআনের সঠিক শিক্ষা নিয়ে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী হয়ে এসেছেন। আর হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্বাবলীকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার অংশ হিসেবেই ১৮৯১ সালে কাদিয়ানে সালানা জলসার প্রবর্তন করেন। সেদিন মাত্র ৭৫ (পঁচাত্তর) জন পুণ্যাত্মা নিয়ে এ জলসা শুরু হয়েছিল। আজ এরই অনুসরণে প্রতিবছর বিভিন্ন দেশে এ জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উপস্থিতি লক্ষের কোটাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এ জলসা সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) নিজেই বলেছেন–"এ জলসা কোন জাগতিক রং তামাসার উদ্দেশ্যে নয়।" (মজমুআ ইশতেহারাত, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৩)

তিনি (আঃ) আরও বলেন–"যতদূর সম্ভব, সাধ্যমত চেষ্টা করে, বন্ধুদের কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র খাতিরে, তরবিয়তী কথা বার্তা শোনার উদ্দেশ্যে এবং দোয়ায় শামিল হবার জন্য নির্ধারিত তারিখে এখানে চলে আসা উচিত। এ জলসায় এমন সব মূল্যবান হাকীকত ও মারেফাতের কথা শোনানো হবে যা ঈমান, ইয়াকীন এবং মা'রেফতকে বাড়ানোর জন্য আবশ্যক। তাছাড়া এসব বন্ধুর জন্য দোয়াও করা হবে। বিশেষ মনোযোগ সহকারে দোয়া করা হবে। (ইশতেহারাত, ৩০শে ডিসেম্বর ১৮৯১)

আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে আগামী ১০, ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারী আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের ৮২তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হবে। ইন্‌শাআল্লাহ্। আমরা যারা এ মহান জলসায় যোগদানের সুযোগ পাচ্ছি, তাদেরকে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) যে উদ্দেশ্যে এ জলসার শুভ সূচনা করেছিলেন সে উদ্দেশ্যকে দৃষ্টিতে রেখে সে অনুযায়ী প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত করা উচিত।

আমরা আল্লাহ্‌তাআলার নিকট দোয়া করি, তিনি আমাদের সব দুর্বলতা ও ভুলত্রুটিকে ক্ষমা করে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) জলসায় যোগদানকারীদের জন্য যে দোয়া করেছেন তা যেন আমাদের জীবনে পূর্ণ হওয়ার সৌভাগ্য দান করেন। আমীন।

৩১ জানুয়ারী, ২০০৬

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
• **কুরআন শরীফ**	৪
• **হাদীস শরীফ**	৫
• **অমৃতবাণী**	৬
• **জুমুআর খুতবা** জলসা সালানার উদ্দেশ্য, তাৎপর্য ও করণীয় অনুবাদ– *আলহাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান*	৭-১৪
• **জুমুআর খুতবা ঃ** **হযরত মুহাম্মদ (সঃ) মানব চরিত্রের উত্তম নমুনা প্রর্দশনের জন্য প্রেরিত হয়েছেন।** *অনুবাদ– মাওলানা জহির উদ্দিন আহমদ ও মাওলানা শরীফ আহমদ*	১৫-২১
• **হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর চিঠি-পত্র** সংকলন– *ইয়াকুব আলী ইরফানী* অনুবাদ– *মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ*	২২-২৪
• **আহমদীয়ত** মূল– কাযী মুহাম্মদ নাযীর সাহেব ফাযেল অনুবাদ– *মোহাম্মদ মুতিউর রহমান*	২৫-২৬
• **মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ হযরত মুহাম্মদ (সঃ)** মূল ঃ হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রাঃ)	২৭-২৯
• **আহমদীয়াত ইয়ানী হাকীকী ইসলাম** মূলঃ হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রাঃ)	৩০-৩১
• **খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী** *মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল*	৩২-৩৩
• **মুলাকাৎ** *সংকলন ও অনুবাদ ঃ* *মরহুম আলহাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী*	৩৪-৩৫
• **কাদিয়ান সফর ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা** *মাহমুদ আহমদ সুমন*	৩৬-৩৮
• **আত্মত্যাগের মাঝেই অপরিসীম কল্যাণ** *হাসেম উল্লাহ সিকদার*	৩৯-৪১
• **ঈদের সাথে ঈদ** *মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়*	৪২-৪৩
• **সংবাদ**	৪৪-৪৫
• **একটি ঐতিহাসিক ছবি**	৪৬

প্রচ্ছদ ঃ দারুল আমান কাদিয়ানে
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)।

সৌজন্যে ঃ হাফিয়া তাসাদ্দক

কুরআন শরীফ

সূরা আত্ তাওবা

لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٨٨﴾

৮৮। কিন্তু এ রসূল ও যারা তাঁর সঙ্গে ঈমান এনেছে এরা এদের ধন-সম্পদ এবং প্রাণ দিয়ে জিহাদ করে; আর এদের জন্যই সব ধরনের কল্যাণ নির্ধারিত এবং তারাই সফলকাম হবে।

اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٨٩﴾

৮৯। আল্লাহ্ এদের জন্য এমন বাগানসমূহ প্রস্তুত করে রেখেছেন যার পাদদেশ দিয়ে নদ-নদী বয়ে যায়, সেখানে এরা চিরকাল থাকবে; এটাই মহান সফলতা।

وَجَآءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٩٠﴾

৯০। আর আরব বেদুঈনদের মাঝে অজুহাত পেশকারীরা[১২০৭] এলো যেন তাদেরকে (বাড়িতে বসে থাকার) অনুমতি দেয়া হয়। এবং যাঁরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের কাছে মিথ্যা বলেছিল তারা (বিনা অনুমতিতেই পেছনে) বসে রইলো। তাদের মাঝে যারা অস্বীকার করেছে তাদেরকে অবশ্যই এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে।

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩١﴾

৯১। দুর্বল, অসুস্থ আর ব্যয় করতে অক্ষম লোকেরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি নিষ্ঠাবান হলে তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। সৎকর্ম পরায়ণদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন অবকাশ নেই এবং আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, বার বার কৃপাকারী।

وَّلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَآ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ اَجِدُ مَآ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ۖ تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ ﴿٩٢﴾

৯২। এবং তাদের বিরুদ্ধেও (অভিযোগ) নেই, যারা তোমার নিকট এসেছিল যেন তুমি তাদেরকে বাহনের ব্যবস্থা করে দাও ; তুমি বলেছিলে, 'বাহন হিসেবে তোমাদেরকে দেয়ার মত আমার কাছে কিছু নেই;' তাদের কাছে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার মত কিছু ছিল না বলে তারা দুঃখে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে ফিরে গল।[১২০৮]

১২০৭। 'আ'যারা' থেকে 'মুয়ায্যের' উদ্ভূত হয়েছে, যার অর্থ অজুহাত দেখিয়েছিল অথবা নিজেকে রেহাই দেয়ার অজুহাত পেশ করেছিল, কিন্তু অব্যাহতি পাওয়ার মত গ্রহণযোগ্য কোন কারণ দর্শাতে পারে নি; সে কোন বিষয়ে অবহেলাকারী ছিল বা অনুপস্থিত ছিল অথবা বাহানা বা অজুহাত উথাপনের মাধ্যমে ত্রুটি করেছিল। সুতরাং উল্লেখিত শব্দের মর্ম হচ্ছে এমন ব্যক্তি যে কর্তব্যকর্মে অবহেলাকারী এবং প্রকৃত কারণ ব্যতীত অজুহাত দেখিয়ে রেহাই পেতে চায় বা নিজেকে দোষমুক্ত বা নিরপরাধ মনে করে (লেইন)।

১২০৮। আয়াতটি সাধারণভাবে সকলের জন্যই প্রযোজ্য। কিন্তু এতে সেই সাত জন দরিদ্র মুসলমান সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ রয়েছে যারা জেহাদে যাওয়ার চরম আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছিল, কিন্তু তাদের এমন কোন উপায় উপকরণ ছিল না যদ্বারা তারা অন্তরের গভীর ইচ্ছা পূর্ণ করতে সমর্থ হতো।

হাদীস শরীফ

জলসার গুরুত্ব

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ্তাআলার কিছু উচ্চ-মর্যাদাসম্পন্ন ভ্রমণরত ফিরিশ্তা সর্বদা এমন মজলিসের সন্ধানে থাকেন যেখানে আল্লাহ্র যিক্র করা হয়। অতএব যখন তারা এমন মজলিসের সন্ধান পান যেখানে (আল্লাহ্র) যিক্র হতে থাকে তাঁরা তাদের সাথে বসে পড়েন এবং নিজেদের পাখা দ্বারা তারা একে অপরকে আবৃত করেন। এমনকি তাদের এবং নিকটবর্তী আকাশের মধ্যবর্তী স্থান পরিপূর্ণ হয়ে যায়। (টীকা ঃ এ রকম মজলিসের ওপর খোদাতাআলা যে কল্যাণ ও বরকত বর্ষণ করে থাকেন তা-ই রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম রূপকভাবে বর্ণনা করেছেন, এটাকে আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করা সঙ্গত হবে না)। অতঃপর যখন লোকেরা ঐ মজলিস হতে উঠে যায় তখন ফেরিশ্তাগণও আকাশে চলে যায়। (সেখানে) সর্বশক্তিমান আল্লাহ্, যিনি তাদের অপেক্ষা বেশি জানেন, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা কোথা হতে এসেছ?' তখন তারা উত্তর দেন, 'তোমারই ঐ সকল বান্দার নিকট হতে এসেছি, যারা পৃথিবীতে তোমার গুণকীর্তন করতেছিল, তোমার একত্ব ঘোষণা করছিল, তোমার প্রশংসায় মুখরিত ছিল এবং তোমার নিকট যাচঞা করছিল।' তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'তারা আমার কি যাচঞা করছিল'? ফিরিশ্তাগণ বলেন, 'তারা তোমার নিকট তোমার জান্নাত যাচঞা করছিল'। আল্লাহ্ পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করেন, 'তারা কি আমার জান্নাত দেখেছে?' ফিরিশ্তাগণ উত্তর দেন, 'হে প্রভু! না তারা দেখে নাই।' তিনি বলেন, 'কী অবস্থা হত যদি তারা জান্নাত দেখত!' তারা বলেন, 'তারা তোমার নিকট আশ্রয়ও প্রার্থনা করতেছিল।' তিনি বলেন, 'তারা কি আমার আগুন দেখেছে?' তারা বলেন, 'না তারা তা দেখে নি।' তিনি বলেন, 'তাদের কি অবস্থা হত যদি তারা আমার আগুন দেখত।' তখন তারা বলেন, 'তারা তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছিল।' তিনি বলেন, 'আমি অবশ্যই তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। তারা আমার কাছে যা যাচঞা করেছে তা আমি তাদেরকে দান করলাম এবং তারা যা হতে আশ্রয় চেয়েছিল তাদেরকে আশ্রয় দিলাম।' তখন তারা বলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্যে একজন তো অত্যন্ত গুনাহ্গার ছিল যে ঐ জায়গায় অতিক্রম করছিল এবং সে তাদের সাথে দর্শকের ন্যায় বসে গেল।' 'তিনি বলেন, 'আমি তাকেও ক্ষমা করে দিলাম; কেননা, তারাতো ঐ সকল আশিস-প্রাপ্ত লোক যে, তাদের সাথে যে-ই বসুক না কেন সেও বঞ্চিত হবে না।"

(মুসলিম কিতাবুয্ যিক্র)।

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

হে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ! তোমরা আশ্চর্যান্বিত হয়ো না যে, খোদাতাআলা এমন প্রয়োজনের সময় এবং গভীর অন্ধকারের যুগে এক ঐশী জ্যোতিঃ নাযেল করেছেন এবং সর্বসাধারণের হিতার্থে, বিশেষতঃ ইসলামের বাণীকে গৌরবান্বিত করার জন্য এবং হযরত 'খায়রুল-আনামের' [হযরত মুহাম্মদ-(সঃ)-এর] নূর বিস্তার করার উদ্দেশ্যে এবং মুসলমানদের সাহায্যকল্পে ও তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা বিশুদ্ধ করার মানসে তিনি তাঁর এক বান্দাকে জগতে প্রেরণ করেছেন। বরং আশ্চর্যের বিষয় এটাই হত যদি সেই খোদা, যিনি ইসলাম ধর্মের সাহায্যকারী, যিনি সর্বদা কুরআনের শিক্ষাকে সংরক্ষণ করবেন এবং এটাকে নিস্তেজ, নিস্প্রভ ও জ্যোতিঃ বিহীন হতে দিবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি এ অন্ধকার দর্শন করে ভিতর এবং বাইরের আপদসমূহ নিরীক্ষণ করেও চুপ থাকতেন এবং আপন প্রতিশ্রুতি স্মরণ না করতেন, যা তিনি তাঁর বাণীতে জোরালো ভাষায় বর্ণনা করেছেন। আমি পুনরায় বলছি যে, যদি এ পবিত্র রসূলের এই পরিষ্কার ও অতি সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী অপূর্ণ থাকত যাতে তিনি বলেছেন, **"প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে খোদাতাআলা এইরূপ এক বান্দাকে সৃষ্টি করবেন যিনি তাঁর ধর্মকে নব-জীবন দান করবেন"** তবেই বিস্ময়ের বিষয় হতো। অতএব এটা আশ্চর্যের বিষয় নয়, বরং হাজার হাজার 'শুক্‌র' বা খোদাতাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের স্থল এবং ঈমান ও একীন বৃদ্ধি করবার সুযোগ যে, খোদাতাআলা আপন দয়া ও অনুগ্রহে স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং স্বীয় রসূলের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করতে এক মিনিটও বিলম্ব ঘটতে দেন নি। কেবল যে তিনি এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করে দেখিয়েছেন তা নয় বরং তিনি হাজার হাজার ভবিষ্যদ্বাণী ও অলৌকিক ব্যাপারের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তবে শুক্‌র কর এবং কৃতজ্ঞতা ভরে সেজদা কর যে, যে যুগের প্রতীক্ষা করতে করতে তোমাদের মাননীয় পিতৃপুরুষগণ পরলোকগমন করেছেন এবং অগণিত ধর্ম-প্রাণ ব্যক্তি যে যুগের জন্য আগ্রহ পোষণ করতে করতে চলে গিয়েছেন, সেই যুগ তোমরা লাভ করেছ। এখন এটার যথোচিত সমাদার করা বা না করা এবং এটা হতে উপকার গ্রহণ করা বা না করা তোমাদের ওপর নির্ভর করছে। এ কথা আমি পুনঃপুনঃ বর্ণনা করব এবং এর ঘোষণা হতে আমি কখনো বিরত হতে পারি না যে, আমিই সে ব্যক্তি যাকে যথাসময়ে জগতের সংস্কারের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে, যেন ধর্মকে পুনরায় নূতনভাবে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

(ফতেহ ইসলাম পুস্তক)

জলসা সালানার উদ্দেশ্য, তাৎপর্য ও করণীয়

[হযরত আমীরুল মু'মিনীন মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) কর্তৃক ৩০ জুলাই, ২০০৪ ইসলামাবাদে (টিলফোর্ড ইউ, কে) প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ, তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠ করে হুযূর (আইঃ) খুতবা ইরশাদ করেন।

আজ ইনশাআল্লাহ্তাআলা জামাতে আহমদীয়া ইংল্যান্ডের ৩৮তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আপনারা সবাই হযরত আকদস মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর আহ্বানে লাব্বায়েক বলে আল্লাহ্তাআলার খাতিরে এখানে ৩ দিন একত্রে থাকার জন্যে এসেছেন। আল্লাহ্ করুন আপনারা হযরত আকদস মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর আকাঙ্ক্ষানুযায়ী জলসার সেসব উদ্দেশ্য পূর্ণকারী হোন। তিনি বলেছেন ঃ "এ অধমের বয়াতের ধারাবাহিকতায় প্রবেশকারী সব নিষ্ঠাবানদের কাছে এটা সুস্পষ্ট হোক যে, বয়াত করার উদ্দেশ্য এই, পার্থিবতার প্রতি আকর্ষণ যেন দূরীভূত হয়ে যায়। নিজ মহান প্রভুর ও রসূলে মকবুল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালবাসা যেন হৃদয়ে প্রাধান্য লাভ করে আর ঐশী ইনকেতা'র (অর্থাৎ পার্থিবতার মোহ থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহ্র দিকে ঝুঁকে পড়া এমন) অবস্থা সৃষ্টি হয়। যাতে আখেরাতের সফর যেন অপ্রীতিকর মনে না হয়।"

আবার জলসার ঘোষণা করতে গিয়ে বলেন, অবস্থাদৃষ্টে উপলব্ধি করা হয় যেন জলসার জন্যে বছরে ৩ দিন এমন নির্ধারিত করা হয় যাতে সব নিষ্ঠাবান ব্যক্তি, যদি খোদা চান, সুস্থ থাকেন, অবকাশ পান আর কঠিন প্রতিবন্ধকতা না থাকে তাহলে নির্ধারিত তারিখে উপস্থিত হতে পারেন (আসমানী ফয়সালা, রূহানী খাযায়েন, ৪ খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৫১)।

"হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, তোমরা যারা বয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছো কেবল মৌখিক দাবী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থেকো না। এখন তোমাদের নিজেদের সংশোধনেরও চেষ্টা করা আবশ্যক। আর সেসব বিষয় কী যা তোমাদের মাঝে সৃষ্টি করতে হবে? তিনি (আঃ) বলেন, সেসব বিষয় এই। আর তোমরা এসব বিষয় নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করে নিলে আমি মনে করবো, তোমরা সত্যিকার অর্থে আমাকে চিনতে পেরেছো এবং যে উদ্দেশ্যে তোমরা বয়াত করে ছিলে তা পুরো করার চেষ্টা করেছো।

প্রথম কথা তো এই, স্মরণ রাখ, আমার বয়াত করে তোমাদের মাঝ থেকে, তোমাদের মন থেকে পৃথিবীর প্রতি আকর্ষণ মিটে যাওয়া উচিত। এটা করতে না পারলে তোমাদের বয়াতের উদ্দেশ্য পুরো হয় নি। তোমাদের দুনিয়ার কাজ কারবার আল্লাহ্র অধিকার আদায়ের পরিপন্থী। তোমাদের কাজ কারবার, তোমাদের আমিত্ব, তোমাদের পার্থিব মান-ইজ্জত, সুখ্যাতি তোমাদের ওপর আল্লাহ্তাআলার সৃষ্টির যে অধিকার রয়েছে এর পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হতে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে আমার জামাতে তোমাদের অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্য পুরো হচ্ছে না।

আবার আল্লাহ্তাআলার ভালবাসা, আল্লাহ্র অধিকার আদায় এবং আল্লাহ্র সৃষ্টির অধিকার আদায়ের সাথে সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন যা তোমাদের নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করতে হবে তাহলো রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালবাসা। দুনিয়ার সব কিছুর প্রতি ভালবাসার চেয়ে তাঁর (সঃ) প্রতি ভালবাসা অধিক হওয়া আবশ্যক। কেননা, এখন আল্লাহ্তাআলার কাছে পৌঁছার সব পথও রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ভালবাসার মাঝে বিলীন হয়েই লাভ হবে, তাঁর (সঃ) অনুসরণেই লাভ হবে; তাঁর (সঃ) নির্দেশাদি পালনেই লাভ হবে, তাঁর (সঃ) সুন্নত পালনেই লাভ হবে। তাই এ ভালবাসাকে নিজের ওপর প্রাধান্য দাও। কেননা, তিনি (আঃ) বলেছেন, স্বয়ং আমি সেই ভালবাসায় আসক্ত। তোমরা আমার বয়াতকারীদের মাঝে গণ্য হবে অথচ আমার প্রেমাস্পদের প্রতি তোমাদের ভালবাসা থাকবে না এটা তো হতে পারে না। আর সেই ভালবাসা থাকবে না যা আমার আছে বা যেভাবে আমার রয়েছে। তিনি (আঃ) আবার বলেছেন, দুনিয়ার এ চমকের সাথে তোমাদের কোন সম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। তোমাদের উদ্দেশ্য এই, আর এটা পুরো করার জন্যে আল্লাহ্র ইবাদতের শর্ত পূর্ণ করার চেষ্টা কর। তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসো। আল্লাহ্র সৃষ্টির অধিকার আদায়

কর এবং আল্লাহ্‌তাআলার আদেশ-নিষেধ পালনার্থে এমনভাবে বিলীন হয়ে যাও যেন তোমাদের এ অনুভূতি সৃষ্টি হয় যেন তোমরা এসব কিছু আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সঃ)-এর ভালবাসায় উদ্দীপ্ত হয়ে করছো। এ অবস্থা যখন সৃষ্টি হবে তখন তোমরা সেসব লোকের মত হা হুতাশ করতে থাকবে না যারা মৃত্যু শয্যায়, মারা যাওয়ার বিছানায় খুবই করুণ ও অস্থিরতায় এ কথা বলতে থাকে, হায়! আমরা জীবনে যদি কোন পুণ্য কাজ করে থাকতাম, আল্লাহ্‌তাআলার ইবাদত নিষ্ঠার সাথে কেবল তাঁরই ইবাদত করে থাকতাম।

বহু লোক বয়াত করার পর নিজেদের দৈনন্দিন কাজ-কর্মে লিপ্ত হয়ে যায়। দৈনন্দিন জীবনের কাজ-কর্মে লিপ্ত হওয়া নিষিদ্ধ নয় বরং প্রয়োজনীয় যেন মানুষ নিজের ও নিজের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির বৈধ প্রয়োজনগুলো পুরো করার উপকরণ সৃষ্টি করে। কিন্তু সাথে সাথে সব সময় একথা মনে রাখা আবশ্যক, আল্লাহ্‌তাআলার আদেশ-নিষেধ অনুযায়ীই সব কাজ করতে হবে এবং আল্লাহ্‌তাআলার আদেশ-নিষেধ সম্বন্ধে জানারও চেষ্টা করতে হবে যেন, যেভাবে আগে উল্লেখ করে এসেছি, বয়াতের সব উদ্দেশ্যও লাভ হয়।

তাই এসব উদ্দেশ্য লাভের জন্যে প্রশিক্ষণ হেতু বছরে ৩ দিন জামাতের ব্যক্তিবর্গ একত্র হয়ে থাকে আর কোন কঠিন অপারগতা না থাকলে সব আহমদী এতে যোগদানের চেষ্টা করে। এটাই ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা। কেননা, প্রশিক্ষণও খুবই প্রয়োজনীয় বিষয়। এ ছাড়া তরবিয়তের ওপর অধঃপতনের অবস্থা আরম্ভ হয়ে যাবে, তরবিয়ত কম হতে আরম্ভ হয়ে যাবে। দেখে নিন, দুনিয়াতে ও নিজ পরিবেশে দৃষ্টি দিলে প্রত্যেক ক্ষেত্রে উন্নতির জন্যে কোন না কোন শিক্ষা পূর্ণ করার পরে প্রশিক্ষণ নেয়ার পর আবার রিফ্রেসার্স কোর্সও হয়ে থাকে, সেমিনার প্রভৃতিও হয়ে থাকে, যে জ্ঞান লাভ হয়েছে যেন তা পোক্ত করা যায়, আরও বৃদ্ধি করা যায়। প্রশিক্ষণের জন্যে কোম্পানীগুলো ও নিজেদের কর্মচারীদেরকে অন্য স্থানে পাঠিয়ে থাকে। দেশের সেনাবাহিনী বছরে একবার সাময়িক যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে নিজেদের জওয়ানদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এ নীতি সব জায়গায় কার্যকর। ধর্মের ব্যাপারেও কার্যকর করা উচিত। তাই নিজেদের ধর্মীয় অবস্থাকে সুসজ্জিত করার লক্ষ্যে জলসাতে অবশ্যই আসুন। এতে আধ্যাত্মিকতায় প্রবৃদ্ধি ঘটবে এবং আরও অন্যান্য উপকারও লাভ হবে। যেভাবে তিনি (আঃ) বলেন ঃ

"যতটা সম্ভব সব বন্ধুকে কেবল রব্বানী বা' আল্লাহ্ সম্পর্কিত কথা-বার্তা শুনার জন্যে ও দোয়ায় অংশ নেয়ার জন্যে সেই তারিখে আসা আবশ্যক। এ জলসায় এমন মাহাত্ম্যপূর্ণ ও তত্ত্বজ্ঞান ভরপুর কথা-বার্তা শুনানোর ব্যবস্থা থাকে যা ঈমান, দৃঢ়-বিশ্বাস ও তত্ত্বজ্ঞানে বুৎপত্তি দানের লক্ষ্যে আবশ্যক। তদুপরি এসব বন্ধুর জন্যে বিশেষ দোয়া এবং বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে আর যতটা সম্ভব রহীম ও রহমান খোদার মহান দরবারে চেষ্ট করা হবে যেন খোদাতাআলা নিজ সন্নিধানে তাদেরকে আকর্ষণ করেন ও নিজের জন্যে গ্রহণ করেন আর তাদেরকে পবিত্র পরিবর্তন দান করেন। আর এসব জলসার সাময়িকভাবে এ উপকারও হবে যে, প্রত্যেক নতুন বছরে যেসব নতুন ভাই এ জামাতে প্রবেশ করবেন তারা সেই নির্ধারিত তারিখে একত্র হয়ে তাদের পুরাতন ভাইদেরকে দেখে নিবেন। আর আপসে পরিচিতি লাভ করে আত্মীয়তা ও পরিচিতির গন্ডী বিস্তৃত হতে থাকবে। আর যেসব ভাই এ সময়ে এ নশ্বর পৃথিবী থেকে চলে যাবেন এসব জলসায় তাদের উদ্দেশ্যে মাগফিরাত ও ক্ষমার দোয়া করা হবে। সব ভাইকে আধ্যাত্মিকভাবে একই সত্তায় পরিণত করার লক্ষ্যে এবং অভ্যন্তরস্থ কাঠিন্য, অপরিচিতি ও কপটতাকে মাঝখান থেকে উঠিয়ে ফেলে দেয়ার জন্যে মহামহিম ও প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ্‌র সমীপে চেষ্টা চালানো হবে। এ আধ্যাত্মিক কল্যাণ ও উপকার হবে যা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ চাইলে সময় সময় প্রকাশিত হতে থাকবে" (আসমানী ফয়সালা, রূহানী খাযায়েন, ৪ খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৫১-৩৫২)।

"যতটা সম্ভব সব বন্ধুকে কেবল রব্বানী বা' আল্লাহ্ সম্পর্কিত কথা-বার্তা শুনার জন্যে ও দোয়ায় অংশ নেয়ার জন্যে সেই তারিখে আসা আবশ্যক। এ জলসায় এমন মাহাত্ম্যপূর্ণ ও তত্ত্বজ্ঞান ভরপুর কথা-বার্তা শুনানোর ব্যবস্থা থাকে যা ঈমান, দৃঢ়-বিশ্বাস ও তত্ত্বজ্ঞানে বুৎপত্তি দানের লক্ষ্যে আবশ্যক। তদুপরি এসব বন্ধুর জন্যে বিশেষ দোয়া এবং বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে আর যতটা সম্ভব রহীম ও রহমান খোদার মহান দরবারে চেষ্ট করা হবে যেন খোদাতাআলা নিজ সন্নিধানে তাদেরকে আকর্ষণ করেন ও নিজের জন্যে গ্রহণ করেন আর তাদেরকে পবিত্র পরিবর্তন দান করেন।

অতএব তোমাদের প্রশিক্ষণের জন্যে, তোমাদের জ্ঞানে প্রবৃদ্ধি লাভের জন্যে আর যারা জানে এবং যাদের এ ধারণা, আগ থেকেই তাদের অনেক জ্ঞান রয়েছে, তাদেরও জ্ঞান তাজা করার লক্ষ্যে এমন পদ্ধতিতে এ প্রশিক্ষণ কোর্স হয়ে থাকে যা আল্লাহ্‌তাআলার তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হবে। নতুন নতুন অনেক তথ্য সম্বন্ধে তোমরা জানতে পারবে। কেননা, প্রত্যেক ব্যক্তির প্রত্যেক কথা তোমাদের কাছে পৌঁছতে পারে না।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) স্বয়ংই এসব তত্ত্ব-জ্ঞানের কথা বর্ণনা করে দিয়ে থাকেন। সেই যুগে প্রকৃত তত্ত্বের কাথা-বার্তাও হতে থাকতো। কিন্তু যেসব নির্দেশ তিনি দিয়ে গেছেনে এখনও সেগুলো থেকে উপকৃত হয়ে সেগুলো বুঝে, সেসব ব্যাখ্যার ওপর আমল করতে থেকে মাশাআল্লাহ্ আলেমরা ভালভাবে প্রস্তুতি নিয়ে দুনিয়ার যেখানে যেখানেই জলসা হয়ে থাকে নিজেরা বক্তব্য দিয়ে থাকেন। খুতবা দিয়ে থাকেন এবং এসব কথা বলে থাকেন। তাই আজও এসব জলসায় এ তাৎপর্যকে দৃষ্টিপটে রাখা আবশ্যক। সেই গরুত্ব আজও আছে আর বক্তৃতাগুলো যখন হতে থাকে তখন সেগুলো চুপ করে শুনা উচিত। আবার তিনি (আঃ) বলেছেন,

অংশগ্রহণকারীদের জন্যে দোয়া করারও সৌভাগ্য লাভ হয়ে থাকে। তাই অংশগ্রহণকারীদের ভাগ্যে আজও হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর দোয়া কল্যাণের কারণ হয়ে যাবে। কেননা, তিনি (আঃ) তাঁর মান্যকারীদের জন্যে, যারা পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং যাদের প্রাণে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সঃ)-এর জন্যে সত্যিকারের ভালবাসা পোষণ করে থাকে, কিয়ামত পর্যন্ত দোয়া করে গিয়েছেন। আবার এখানে এসে একে অপরের দোয়ার অংশ নিয়ে থাকে। সাময়িক উপকারও লাভ হয়ে থাকে। একে অপরের সাথে পরিচিতি লাভ হয়, অবস্থা সম্বন্ধে জানা হয়ে থাকে। এখন তো বিশ্ব এমনিতেই একত্র হয়ে গেছে। দূরত্ব এত কম হয়ে গেছে যেন সারা বিশ্বের লোক কমপক্ষে প্রতিনিধির আকারে একত্র হয়ে যায়। এতে একে অপরের অবস্থা সম্বন্ধে জানতে পারে। তাদের জন্যে দোয়া করার সৌভাগ্য লাভ হয়। আর আপসে এভাবে মিলে মিশে, একত্র হতে গিয়ে ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। আপসে সম্পর্ক এবং প্রীতিও বাড়ে এবং কখনও সত্যিকারের আত্মীয়তাও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কেননা, অনেক রকম সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যায়। বিয়ে-শাদীর অনেক সমস্যার সামধান হয়ে যায়। এবং এতে জামাতে যে দৃঢ়তা সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক তা সৃষ্টি হয়ে থাকে। আর অচেনা ভাবও দূর হতে থাকে। একে অপরের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ কম হতে থাকে। যখন এমন বিষয়ের, আপসে লোকদের অসন্তুষ্টির কথা জানা যায় তখন তা দূরীকরণের লক্ষ্যে দোয়া করারও সৌভাগ্য লাভ হয়ে থাকে। আর যারা চলতি বছর মারা গিয়ে থাকেন তাদের আত্মার মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে দোয়ার সুযোগ লাভ হয়ে থাকে। যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, আল্লাহ্তাআলার দিকে নিয়ে যাওয়ার কথা-বার্তা শুনার প্রেরণা থাকবে। কিন্তু জলসায় আগমনকারীরা কেবল সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে একত্র হওয়ার জন্যে যেন এখানে না আসেন। যখন এখানে আসেন তখন গভীর মনোযোগে সহকারে সব প্রোগ্রামে যেন উপস্থিত থেকে শুনেন। এর ব্যাপারে শিথিলতা দেখালে পরে এখানে বসা ও বক্তৃতা শোনাতে কোন উপকার হতে পারে না। এজন্যে বাইরে থেকে আগমনকারীরাও যে ব্যয় নির্বাহ করে আসেন আর এখানে অবস্থানকারীরাও জলসার বক্তৃতা চলাকালীন পুরোপুরি দৃষ্টি দেন এবং খুবই মনোযোগ দিয়ে ও একগ্রতার সাথে জলসার কার্যক্রম শুনেন।

হযরত আকদস মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেন, "সবাইকে মনোযোগসহকারে শুনা আবশ্যক। পুরোপুরি মনোযোগ ও চেষ্টার সাথে শুন। কেননা, এটা ঈমানের ব্যাপার। এতে শিথিলতা, অমনোযোগিতা আর বেখেয়াল খুবই কুফল সৃষ্টি করে থাকে। যে-ব্যক্তি ঈমানের ব্যাপারে অমনোযোগিতার সাথে কাজ করে এবং তাকে উদ্দেশ্য করে যখন কিছু বর্ণনা করা হয় তখন মনোযোগ দিয়ে তা শুনে না।

কোন বক্তা অস্পষ্ট বক্তৃতা করুন বা না করুন। তার কথা ও আওয়াজের জাদুতে আপনার আবেগকে উজ্জীবিত করুক বা না করুক। বক্তৃতা শুনুন এবং এতে জ্ঞান ও অধ্যাত্মিক বিষয়ক চিহ্ন অন্বেষণ করুন পরে এথেকে উপকৃত হোন।

বর্ণনাকারীর কথা যতই উচ্চস্তরের কল্যাণজনক ও প্রভাবসম্পন্ন হোক না কেন তাতে কোন উপকার হয় না। এমন সব লোকের বেলায়ই বলা হয়ে থাকে, তারা কান পেতে রাখে কিন্তু শুনে না, মন দিয়ে রাখে কিন্তু বুঝে না। অতএব স্মরণ রাখ, যা কিছু বলা হয় তা একাগ্রতা ও মনোযোগ গভীর সহকারে শুন। কেননা, যে একাগ্রতার সাথে শুনে না সে দীর্ঘদিন পর্যন্ত উপকারকারী সত্তার সংস্পর্শে থাকলেও কিছুই কল্যাণ লাভ করতে পারে না" (আল্ হাকাম, ১০ মার্চ, ১৯০২)।

দেখুন, কতই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়েছে! সেসব লোকদের ব্যাপারে যারা জলসায় এসে জলসার কার্যক্রম গভীর মনোযোগ সহকারে শুনে না! তাই এসব লোকদের অবস্থা সেই রকম যাদের কান ও মন থাকা সত্ত্বেও তারা শুনতেও চেষ্টা করে না এবং বুঝতেও চেষ্টা করে না। আল্লাহ্ করুন করুন! আর প্রত্যেক আহমদীকে এথেকে রক্ষা করুন!

আবার তিনি (আঃ) বলেন, "সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনুন। আমি নিজ জামাত, স্বয়ং নিজ সত্তা ও নিজের আত্মার জন্যে এটাই চাই ও পসন্দ করি, বাহ্যিক কাথা-বার্তা যা বক্তৃতায় হয়ে থাকে সেগুলোকেই পসন্দ যেন না করা হয় আর সব উদ্দেশ্য যেন এর ওপরেই থেমে না যায়। যে বক্তা যত যাদু ভরতি কথা বলেছেন! বাক্যে কতই জোর! আমি এ কথায় সন্তুষ্ট নই। আমি তো এটাই পসন্দ করি এবং বানানো ও লৌকিকতাপূর্ণ কথা নয় বরং আমার স্বভাবের এটাই চাহিদা।" এটাই চায়। যে কাজ হোক আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হোক। যে কথা হোক আল্লাহ্র উদ্দেশ্য হোক।.....

পতন আসার এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ"। অর্থাৎ দুর্বলতা ও পতন যা-ই এসেছে এর এটাই কারণ" নচেৎ এতটা সমাবেশ এবং আঞ্জুমান ও মজলিসসমূহ হতে থাকে আর সেখান বড় বড় বক্তা নিজ নিজ বক্তব্য পাঠ করতেন ও বক্তব্য পেশ করতেন। কবি গোষ্ঠীর অবস্থার ওপর শোক-গাঁথা করে থাকে। সে কথা কি যে, এর কোনই প্রভাব পড়ে না? জাতি দিন দিন উন্নতির বদলে পতনের দিকে ধাবিত হয়?" আবার বলেন, "কথা এটাই, এসব মজলিসে আগমনকারীরা আন্তরিকতার সাথে আসে না" (মলফূযাত, ১ম খন্ড, ২৬৫-২৬৬, নতুন সংস্করণ)।

কখনও কখনও জলসা চলাকালীন সময়ে একথা বলতে বলতে বাইরে এসে যায় যে, অমুক বক্তার যে ভঙ্গি যেভাবে তিনি বলছেন, আমি তো সেভাবে শুনতে পারছি না। তাই বাইরে এসে গেছি। এটাও এক রকম অহংকার। আর কোন বক্তা অস্পষ্ট বক্তৃতা করুন বা না করুন। তার কথা ও আওয়াজের জাদুতে আপনার আবেগকে উজ্জীবিত করুক বা না করুক। বক্তৃতা শুনুন এবং এতে জ্ঞান ও অধ্যাত্মিক বিষয়ক চিহ্ন অন্বেষণ করুন পরে এথেকে উপকৃত হোন। তিনি (আঃ) বলেছেন, যারা কেবল আওয়াজ ও কথার জাদুতে

প্রভাবিত হয়ে থাকে তারা কখনও উন্নতি করে না। কেননা, সাময়িক প্রভাব হয়ে থাকে আর মজলিস থেকে উঠে গেলেই প্রভাব শেষ হয়ে যায়। আর এটা একজন আহমদীর মাঝে থাকা উচিত নয়।

আবার তিনি (আঃ) বলেছেন, "এ জলসার আহ্বান ও আসল উদ্দেশ্য ছিল এই ঃ আমাদের জামাতের লোক কিভাবে বার বার সাক্ষাতে নিজের মাঝে পরিবর্তন লাভ করে যেন তাদের মন আখেরাতের প্রতি সর্বৈব ঝুঁকে যায় আর তাদের মাঝে খোদাতাআলার ভয় সৃষ্টি হয়, তারা সাধনা, তাকওয়া, খোদাভীতি ও পরহেযগারী আর কোমল হৃদয় ও পারস্পরিক ভালবাসা এবং ভ্রাতৃত্বের ব্যাপারে অন্যদের জন্যে দৃষ্টান্তে পরিণত হয়ে যায়। বিনয়, নম্রতা ও নিষ্ঠা তাদের মাঝে সৃষ্টি হয় আর ধর্মীয় বিষয়াদিতে উৎসাহ অবলম্বন করে।"

আবার তিনি (আঃ) বলেন, "এ জলসা এমন তো নয় যে, দুনিয়ার মেলাগুলোর ন্যায় অযথা বাধ্য-বাধ্যকতাকে আবশ্যিক করে নেয়, বরং এর অনুষ্ঠান সুস্থ নিয়্যতে করা হয়, অন্যথায় মুল্যহীন।" অর্থাৎ এর **আসল নিয়্যত হলো অধ্যাত্মিক সম্মানের প্রবৃদ্ধি, আল্লাহ্-তাআলার নৈকট্য লাভ, রসূল (সঃ)-এর সুেহধন্য হওয়া নচেৎ এতে কোন উপকার নেই**। আবার তিনি (আঃ) বলেন, "যতক্ষণ এটা জানা না যায়, অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য না দেয় যে, এ জলসা থেকে ধর্মীয় উপকার সাধিত হয় আর লোকদের চাল-চলন ও আচর-আচরণের ওপর এর এ প্রভাব সৃষ্টি হয় ততক্ষণ এমন জলসা কেবল অনর্থকই নয় বরং জ্ঞান লাভের পর যে, এ সমাবেশের ফলে পবিত্রতা সৃষ্টি হয় না, একটি অপকর্ম ও অন্ধকার ভ্রষ্টতা ও বি'দাতপূর্ণ কাজ। আমি বর্তমান কালের কোন কোন পীরজাদার ন্যায় কেবল বাহ্যিক জাঁকজমক দেখানোর লক্ষ্যে নিজের বয়াতকারীদেরকে একত্র করতে কখনও চাই না।" কেবল এজন্যে একত্র করি না যে, দেখ, কত লোকেরা একটা সমাবেশ একত্র হয়ে গেছে! "বরং সেই ফলাফল যার জন্যে আমি বাহানা বের করি অর্থাৎ আল্লাহ্র সৃষ্টির সংশোধন"। সেই উদ্দেশ্য যার জন্যে এ কারণ সৃষ্টি করা হয়েছে তা হলো আল্লাহ্র সৃষ্টির সংশোধন।" **আমি সত্য সত্য বলছি, মানুষের ঈমান কখনও সঠিক হতে পারে না যতক্ষণ নিজের আরামের ওপর নিজ ভাইয়ের আরামকে যথাসম্ভব শ্রেয় মনে না করে। আমার এ ভাই যদি নিজ দুর্বলতা ও অসুস্থতা সত্ত্বেও মাটিতে শোয় আর আমি নিজ স্বাস্থ্য ও সুস্থতা সত্ত্বেও চৌকি দখল করে থাকি যেন সে এতে বসে না পড়ে তাহলে আমার অবস্থা দুঃখজনক। আমি যদি না উঠি এবং ভালবাসা ও সহানুভূতির বশবর্তী হয়ে নিজের চৌকি তাকে না দিই এবং নিজের জন্যে মাটিতে পাতা-বিছানা পসন্দ করি এমতাবস্থায় যে আমার ভাই অসুস্থ ও কোন ব্যথায় কাতর তাহলে আমার অবস্থা দুঃখজনক অথচ আমি এ অবস্থায় শান্তিতে ঘুমিয়ে থাকি।" আর তার জন্যে যতটা আমার সাধ্যে কুলোয় আরাম পৌঁছানোর চেষ্টা না করি আর আমার কোন ধর্মীয় ভাই নিজ অহমিকায় আমার সাথে কিছু করতে কঠোরতা করলে আমিও যদি জেনে-বুঝে কঠোরতা করি তাহলে আমার অবস্থার ওপর আফসোস।**

বরং তার কথায় আমার ধৈর্য ধারণ করা নিজ নামাযে তার জন্যে কেঁদে কেঁদে দোয়া করা উচিত। কেননা, সে আমার ভাই এবং আধ্যাত্মিকভাবে অসুস্থ। আমার ভাই যদি সরল সোজা বা কম শিক্ষিত হয় বা সরলতার সাথে কোন ত্রুটি করে বসে সেক্ষেত্রে তাকে আমার ঠাট্টা করা বা ভ্রু কুচকিয়ে তেজ দেখানো উচিত নয়, অথবা এসবই ধ্বংসের পথ। এ কুমতলবে অন্তর কোমল না হলে কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারে না। যতক্ষণ সে তার নিজ সত্তাকে সকলের চেয়ে অধিকতর তুচ্ছ মনে না করে, যতক্ষণ সে নিজেকে নিজে সকলের চেয়ে তুচ্ছ মনে না করে এবং সব 'নেতাগিরী' দূর না হয়ে যায়। জাতির সেবক হওয়া কোমল আচরণ করা ও বিনয়ের সাথে কথা বলা আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয় হওয়ার চিহ্ন আর মন্দ আচরণের জবাব সদাচরণের মাধ্যমে দেয়া সৌভাগ্যের চিহ্ন এবং রাগকে হজম করে ফেলা এবং কটু বাক্যকে হজম করে নেয়া খুবই উন্নত স্তরের সাহসিকতার কাজ" (শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, খন্ড ৬, পৃষ্ঠা ৩৯৪-৩৯৬)।

এখানে তিনি আল্লাহ্র হক্ (অধিকার) ও বান্দার হকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যেন জলসায় উপস্থিত হয়ে জলসার বক্তৃতাগুলো শুনেও যদি এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ না হয় তাহলে জলসায় আসা নিরর্থক। যেভাবে আমি আগেও বলেছি, এ কথায়ও কোন লাভ নেই যে, সাময়িক উৎসাহে জলসায় এসেছেন, যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)ও বলেছেন, আর জলসা শেষ হওার সাথে সাথে বাইরে যান তাহলে আবেগের ওপর এতটুকুও নিয়ন্ত্রণ থাকে না যে, অন্যে কোন কথা সহ্য করতে পারে। এমন অবস্থায়ই যদি থাকতে হয় তাহলে এটাই উত্তম যেন জলসায় না আস। তাদের দিয়ে যাদের নিজের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না কোন কোন ঘটনা এখানে ঘটে যায়। সঠিকভাবে না নিজে জলসা শুনে আর অন্যদেরকেও শুনতে দেয় না এবং সামান্য সামান্য কথায় মাথা ফাটাফাটিও হতে থাকে। তাই এসব লোক তো সেই রকমই যাদের সম্বন্ধে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, কান আছে অথচ শুনে না আর মন আছে তো বুঝে না। সামান্য চিন্তা করুন, এরা কারা? আল্লাহ্তাআলা এসব লোকদের চিহ্ন বলতে গিয়ে বলেছেন, এরা নবীদের অস্বীকারকারী। যখন এভাবে রীতি অবলম্বন করে তখন জামাতী ব্যবস্থাপনা কার্যকরী ব্যবস্থা নিলে পরে এ অভিযোগ উঠতে থাকে, কর্মকর্তারা আমাদের সাথে দুর্ব্যবহার করেছেন। আর আমাদেরকে এটা বলেছেন সেটা বলছেন। এটা ঠিক যে, আমি কর্মকর্তাদেরকে কয়েকবার বুঝিয়েছি, সরাসরি তাদেরকে কিছু বলা উচিত নয়। এমন সব লোক যারা নিজেদের কৃত-কর্ম দিয়ে স্বয়ং বলছে, আমরা নেযামকে কোন একটা কিছু মনে করি না, জলসার পবিত্রতা কিছু মনে করি না সেক্ষেত্রে তাদের বেলায় একটাই প্রতিকার আছে, সেই অহমকির কারণে তাদেরকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা

যায়। বিগত বছর এমন ২/১ টি ঘটনা ঘটেছিল। তাই এ বছরও যদি কেউ এ নিয়্যতে এস থাকেন যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের কোন বালাই নেই কেবল ফাসাদ সৃষ্টি করাই কাম্য তাহলে পরে জলসায় না আসাটাই উত্তম। আর যদি এসেই থাকেন তাহলে চলে যাওয়াটাই উত্তম যেন নেযামে জামাতে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আপত্তি না ওঠে। বিগত জুমুআয় আমি কর্মকর্তাদেরকে এবং এখানকার বাসিন্দাদেরকে, যারা লন্ডন বা ইসলামাদের পরিবেশে বসবাস করেন, এটা বলেছিলাম, মেহমানেওয়াজীরও শর্ত পালন করুন। কিন্তু আগমনকারী মেহমানদেরও খেয়াল রাখা আবশ্যক যেন তারা দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাদেরকে পরীক্ষায় না ফেলে আর যে ব্যবস্থাপনা রয়েছে এর সাথে পুরোপুরি সহযোগিতা করে। তাই যেখানে খেদমতকারী বা মেহমানদের খেদমতের উদ্দেশ্যে ভরপুর মেহনত করে সেবা প্রদান করে থাকে সেখানে মেহমানদেরও অবশ্য কর্তব্য যেন তারা মেহমান হওয়ার শর্তাবলীও আদায় করেন আর যে উদ্দশ্যে এসেছেন তা পুরো করার চেষ্টা করেন। হযরত আকদস মসীহে মাওউদ (আঃ) যে পবিত্র পরিবর্তন আমাদের মাঝে সৃষ্টি করতে চান তা নিজেদের ওপর কার্যকরী করার চেষ্টা করেন।

তিনি (আঃ) বলেন ঃ পুণ্যকর্মকে কেবল এ উদ্দেশ্যে করা উচিত যেন খোদাতাআলা সন্তুষ্ট হন, তাঁর সন্তুষ্টি লাভ হয় এবং তাঁর আদেশ পালিত হয়। এতে পুণ্য হোক বা না হোক সর্বতো দৃষ্টি এর ওপর দিতে হবে। ঈমান তখনই পূর্ণতা লাভ করে যখন এ প্ররোচনা ও ধারণা মাঝ খান থেকে সরে যায় যদিও এ কথা ঠিক, খোদাতাআলা কারও পুণ্যকর্ম বিনষ্ট করেন না। কিন্তু পুণ্যকর্ম সম্পাদনকারীর পুরস্কারের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত নয়। দেখ, কোন মেহমান যদি এ উদ্দেশ্যে এখানে এসে থাকেন, সেখানে আরাম পাওয়া যাবে, ঠান্ডা শরবত পাওয়া যাবে, বা আনুষ্ঠানিক খাবার পাওয়া যাবে তখন সে যেন সেসব জিনিসের জন্যেই এসে থাকে। যদিও অতিথি সেবকের কর্তব্য হয়, যতটা সম্ভব মেহমাননেওয়াযীতে কোন কমতি যেন না করে এবং তার আরামের ব্যবস্থা করে ও করতে থাকে। কিন্তু মেহমানের নিজের এদিক দৃষ্টি দেয়া তার জন্যে ক্ষতির কারণ।"

(তফসীর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ), ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৩৪)।

অতএব যেসব মেহমান আসছে এ পুণ্য উদ্দেশ্যে যেন আসে আর কোন সুযোগ-সুবিধা যদি লাভ হয়, আরাম-আয়েসে দিন কেটে যায় তাহলে খোদার শোকরিয়া আদায় করে যে, তিনি এ উপকরণের যোগান দিয়েছেন। যেভাবে হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেছেন, আল্লাহ্তাআলা বিনা পুরস্কারে কোন পুণ্য কর্মকে যেতে দেন না। তাই আপনাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য বিনষ্ট করবেন না। অগণিত অনুগ্রহ ও কল্যাণ অবতীর্ণ হবে।

একটি হাদীসে এসেছে। একটি দোয়া রয়েছে প্রত্যেক আগমনকারী মেহমানকে তা পড়তে থাকা উচিত। হযরত খাওলা (রাঃ) বিনতে হাকীম বর্ণনা করেন। আমি হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে এটা বলতে শুনেছি, যে-ব্যক্তি কোন বাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা হওয়ার সময় বা কোন স্থানে তাঁবু খাটানোর সময় দোয়া করে, আ'উযু বি কালিমাতিল্লাহি ত্তাম্মিাতি মিন শার্ রি মা খলাক্ব অর্থাৎ আমি আল্লাহ্র পরিপূর্ণ কথার আশ্রয়ে আসছি আর সেই অনিষ্ঠ থেকে, যা আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন আশ্রয় চাচ্ছি। তখন সেই ব্যক্তিকে এখানে থাকার ব্যবস্থা পরিত্যাগ করতে বা এ স্থান পরিত্যাগ করার আগ পর্যন্ত কোন কিছু ক্ষতি করবে না (মুসলিম কিতবুয্ যিক্র)।

এ দোয়া পাঠ করতে থাকা উচিত। আল্লাহ্তাআলা প্রত্যেক আগমনকারীকে প্রত্যেক অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। আর প্রত্যেক প্রভাব গ্রহণ করে এখান থেকে যান এবং পুণ্য প্রভাব রেখে যান।

যেভাবে হযরত আকদস মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেছেন, জলসায় আগমনকারী মেহমান-দেরকে এ উদ্দেশ্য দৃষ্টিপটে রাখা আবশ্যক, আপসে ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হলে এ কথায় যে শিক্ষা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আমদেরকে দিয়েছেন তা-ও এ বর্ণনা থেকে প্রকাশিত হয়ে থাকে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কাছে আবেদন করে কোন্ ইসলাম সবেচে' উত্তম। তিনি (সঃ) বল্লেন, অভাবীদের খাবার খাওয়াও আর তুমি চিনতে পার বা না পার সব ব্যক্তিকে সালাম দাও (সহী বুখারী, কিতাবুল ঈমান)।

তাই যখন এভাবে সালামের প্রচলন হবে তখন আপসে ভালবাসা বাড়বে। আর ইনশাআল্লাহ্তাআলা যখন আপনারা একে অপরকে সালাম করতে থাকবেন, সব দিকে সালাম সালাম রব আসতে থাকবে তখন এ জলসা ভালবাসার সফরের জলসায় পরিণত হবে। কেননা, কেবল আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে এসব কার্যক্রম হতে থাকবে। তখন আল্লাহ্র ভালবাসার বিশেষ দৃষ্টি আপনাদের ওপর পড়ে থাকবে। তাই এ দিনগুলোতে বিশেষভাবে মহিলারাও শিশুরাও, পুরুষরাও সালামের বহুল প্রচলন করুন। কেননা, এতে এক তো আপসে ভালবাসা বাড়বে আবার ইসলামে সঠিক দৃষ্টান্ত ও উপস্থাপিত হতে থাকবে যা অন্যদের দৃষ্টিতেও আসতে থাকবে।

এখানে জলসার প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আমি বলতে চাচ্ছি। এসব মেহমান, অতিথি সেবক ও কর্তব্যরত প্রত্যেকের ওপর প্রযোজ্য।

প্রথম কথা তো এই ; মসজিদে ও মসজিদের পরিবেশে এর আদব ও পত্রিতার প্রতি দৃষ্টি রাখুন। এখান থেকে যখন মসজিদ ফযলে যাবেন সেখানেও যথেষ্ট ভীড় হবে।

* জলসার দিনগুলোতে এ মার্কিও মসজিদে রূপান্তরিত হয়। বরং এ গোটা এলাকা অর্থাৎ জলসাগাহ এতেও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী সেই দৃশ্যই দৃষ্টিতে আসা আবশ্যক যা এমন এক পবিত্র পরিবেশে দৃষ্টিতে আসা আবশ্যক। যেখানে কেবল আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সঃ)-এর কথা হতে থাকে একে অপরের অধিকার আদায়ের কথা-বার্তা হতে থাকে।

* জলসার দিনগুলোতে যিক্‌রে ইলাহী ও দুরূদ শরীফ পড়ে পড়ে অতিবাহিত করুন আর অনুনয় বিনয়ের সাথে, রীতিমত, একাগ্রতার সাথে বাজামাত নামাযের অনুশীলন করুন।

*** নামায ও জলসার কার্যক্রমের সময় ছেলে পেলেদের চুপ করানোর ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। কর্তব্যরত লোকেরাও এসব ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন। আর মা বাবাও এ দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখুন। এবং কর্তব্যরত লোকদের সাথে সহযোগিতা করুন। ছেলে-পেলেদের জন্যে যে স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে সেখানে গিয়ে ছোট শিশুদের বসান যাতে জলসার শ্রবণকারীদের ব্যাঘাত না ঘটায়।**

*** জলসার সময় বাইরের কোন মেহমানের বক্তৃতা যদি শোনেন, এর কোন কথা যদি আপনাদের ভাল লাগে এবং বাহ্‌বা দিতে চান তাহলে এজন্যে তালি বাজানোর পরিবর্তে , যা আমাদের রীতি,আল্লাহু আকবর ধ্বনি দেয়া মাশাআল্লাহ্ প্রভৃতি বাক্য বলা উচিত। কেননা, তালি বাজানো আমাদের ঐতিহ্য নয়। আমাদের নিজেদেরও কিছু রীতি-নীতি আছে। এদিকে দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। এখানে এবং বিশ্বে যেখানে যেখানে জলসা হয়ে থাকে এসব রীতি-নীতির প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।**

* নারা বা ধ্বনি প্রসঙ্গে স্মরণ রাখুন, প্রত্যেকেই নিজের ইচ্ছানুযায়ী নারা লাগাবেন না বরং ব্যবস্থাপনা এ প্রসঙ্গে প্রোগ্রাম তৈরী করেছে। কোন কোন লোকের ওপর নারা লাগানোর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। যারা যখন নারা লাগানোর দরকার মনে করবেন তখন নারা লাগাবেন। কিন্তু কখনও কখনও এটাও হয়ে থাকে, নারা না লাগানো হলে বক্তৃতার মাঝে কোন কোন লোকের ঘুম এসে যায়। এসব লোকের জন্যেও নারার প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু বিনা কারণে নারা লাগাতে গেলে, নযম বা বক্তৃতা চলতে থাক কখনও কখনও এর স্বাদ থাকে না। এমন লোক যাদের ঘুম এসে যায় তাদেরকে পাশ্ববর্তী লোক চপে চুপে টোকা মেরে যেন জাগিয়ে দেয়।

* ইংল্যান্ডের আহমদীদের অনেকেই আল্লহ্‌তাআলার ফযলে এখানে এসেছেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর তো এ ইচ্ছা ছিল, সবাই যেন যোগ দেন। তাই খুবই উৎসাহের সাথে জলসায় যোগ দেয়া আবশ্যক। যারা এখনও আসেন নি তারাও যেন কমপক্ষে অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার আগেই যোগ দান করেন। কেননা, কোন কারণ ছাড়া জলসায় অনুপস্থিত থাকা উচিত নয়। কোন কোন সময় এটাও দেখা গেছে, কোন কোন লোক কেবল দু'দিন বা শেষ দিনেই এসে গেছেন। তাদের কোন বাধা নেই। কেননা, শনি ও রবিবার প্রায় প্রত্যেকেরই ছুটি হয়ে থাকে। আর উদ্দেশ্য এই, শেষের দিন যাব কিছু দেখা-সাক্ষাৎ তো হয়ে যাবে। কোন কোন লোকের সাথে সাক্ষাৎ করবো। ঠিক আছে। নিজের এক উদ্দেশ্য তো পুরো করে নিয়েছেন কিন্তু কেবল এ উদ্দেশ্যই নয়। আল্লাহ্‌তাআলা এবং তাঁর রসূল (সঃ)-এর ভালবাসা সৃষ্টি করা সব চেয়ে বড় উদ্দেশ্য।

* এটা আমি আগেও বলেছি, বক্তৃতাগুলো রীতিমত শুনতে থাকুন। যতটা সম্ভব শুনা আবশ্যক। আর এতে কর্তব্যরত কর্মীরাও, যদি তাদের সে সময় কোন দায়িত্ব না থাকে তাদেরও বক্তৃতাগুলো শুনার দিকে মনোযোগ দেয়া আবশ্যক।

* এসব দিনে পুরোপুরি গুরুত্ব দিয়ে সব নামায আদায় করার প্রতি মনোযোগ দিন। লঙ্গরখানা বা যেখানে যেখানেই দায়িত্ব অর্পণ করা হয় সেখানেও কর্মীগণকে রীতিমত নামায আদায়ের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। আর তাদের উপরস্থ কর্মকর্তার দায়িত্ব যেন এদিকে তারা দৃষ্টি রাখেন।

* নামাযের সময় যখন আপনি নামায পড়তে মার্কিতে আসেন তখন নামায আরম্ভ হওয়ার আগেই এসে বসে যান। কেননা, এখানে কাঠের পাটাতন রয়েছে যদিও এর ওপর পাতলা ধরনের কার্পেট বিছানো হয়েছে। কিন্তু চলার সময় একটি শব্দ সৃষ্টি হয় আর নামাযে ব্যঘাত সৃষ্টি হতে থাকে। অন্যের কাছে, যারা নামায পড়ছে শব্দই পৌঁছে না। কালও মাগরিবের নামাযের সময় শব্দের ধারা চলছিল আর তা দ্বিতীয় রাকাআত পর্যন্ত চলছিল। তাই নামাযে প্রথমে এসেই বসে যান।

* কোন কোন লোকের মোবাইল ফোন খুবই গুরত্ববাহী হয়ে থাকে (এখনও সম্ভবত কারও ফোন বেজে চলেছে) এতই ফোন যদি আসার সম্ভাবনা থাকে তাহলে তিনি এখন উন্নত ধরনের ফোন রাখুন যার শব্দ কম করা যেতে পারে। পকেটে রাখুন। এর কম্পনে (Vibration) আপনি ফোন আসার কথা বুঝতে পারবেন এবং বাইরে গিয়ে শুনে নিবেন। কমপক্ষে নামাযের সময়, জলসার সময় আর বক্তৃতা চলার সময় লোকদেরকে বিরক্ত করবেন না।

* জলসার সময় বাজার বন্ধ থাকা আবশ্যক। আগমনকারী মেহমানরাও শুনে নিন আর এখানে বসাবসকারীরাও শুনে নিন, কর্তব্যরত কর্মীরাও শুনে নিন, আগে বলা হতো, বিশেষ প্রয়োজেন থাকলে কোন কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করা যেতে পারে। সেসব দোকান খোলা থাকবে এবং ব্যবস্থাপনা খোঁজ-খবর নিতো কোন্ কোন্ দোকান খোলা রাখবে বা রাখবে না। কিন্তু কাল আমি বাজারের ব্যাপারে নিজে যখন খোঁজ-খবর নিয়েছি এরপর আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, **কোন দোকান খোলা রাখার প্রয়োজন নেই। জলসা চলাকালীন সময়ে সব দোকান বন্ধ থাকবে। যেসব দোকানদার স্টল লাগিয়েছে তারা সবাই জলসা শুনবেন এবং কোন খরিদ্দার সেখানে যাবেন না। কোন প্রকার বেচা-কেনা হওয়া উচিত নয়।** কেননা, জরুরীভাবে কোন জিনিসের প্রয়োজন দেখা দিলে জলসার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সে জিনিষ সরবরাহ করা হবে। তাই কোন প্রকার দোকান খোলা রাখার প্রয়োজন নেই।

* অযথা কথা-বার্তা পরিহার করুন। আপসে কথা-বার্তায় স্বর নিচু করুন এবং মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখুন। কঠোর ও কর্কশ বাদানুবাদ পরিত্যাজ্য। কেননা, ভালবাসা ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ এভাবে সৃষ্টি হবে। কথা-বার্তায়ও একে অন্যের প্রতি দৃষ্টি রাখুন।

কখনও কখনও ছোট ছোট কথা-বার্তায়ও যুবকদের 'তুই তোকরি' শুরু হয়ে যায়। এথেকে সুরক্ষা লাভ ও একে পরিহার করা এবং এড়িয়ে যাওয়া আবশ্যক।

কখনও কখনও দল বেঁধে বসে থাকে এবং ঠাট্টা-মস্করা চলতে থাকে, কথা-বার্তা বলতে থাকে। এটাও ভাল অভ্যাস নয়। কখনও কখনও অনেকে ভিন দেশী লোক এসে থাকে। এদের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা হয়ে থাকে। কথা বুঝা যায় না। যখন আপনি কথা বলেন আর কেউ কাছ দিয়ে চলে যায় কখনও কখনও এটা মনে করে নেয়, সম্ভবত আমার সম্বন্ধে হাসি-বিদ্রূপ করছে। তখন পরিবেশকে সুস্থ রাখার জন্যে এসব বিষয় পরিহার করা আবশ্যক।

* ইসলামাবাদের পরিবেশে ও যখন ইসলামাবাদের রাস্তাগুলো আসে সেগুলো খুবই ছোট মনে হয়। এখানেও হট্টগোল বা হর্ন প্রভৃতি বা প্রত্যেক ধরনের এমন কাজ-কর্ম থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। কেননা, এখানকার লোকদের পক্ষ থেকে কখনও কখনও অভিযোগ করা হয়ে থাকে। কালও কেউ আমাকে বলেছেন, এখানকার পত্রিকায় সংবাদ ছিল, গন্ডগোল হয় বলে লোকদের আপত্তি সৃষ্টি হচ্ছে। তাই এ পরিবেশের প্রতি লক্ষ্য রেখে কোন প্রকার হট্টগোল সৃষ্টি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

* গাড়ীগুলো পার্ক করতে গিয়েও দৃষ্টি রাখুন যেন ঘরের সামনে বা নিষিদ্ধ স্থানে পার্ক না করা হয়। ট্রাফিকের নিয়ম-কানুনের প্রতি দৃষ্টি রাখুন। জলসাগাহেও যে পার্কিং এলাকা রয়েছে সেখানেও ব্যবস্থাপকদের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করুন আর যেখানে তারা গাড়ী রাখতে বলে সেখানে রাখুন।

গাড়ী চালানোর সময় এ দেশের নিয়ম-কানুন পুরোপুরি পালন করুন। কেননা, ইউরোপে কোন কোন স্থানে কোন কোন রাস্তায় Speed Limit (গতি নিয়ন্ত্রিত) নেই অথবা Speed Limit এখান থেকে বেশি। এখানকার Speed Limit ও সেখাকার Speed Limit-এ পার্থক্য রয়েছে। ইউরোপ জার্মানী প্রভৃতি স্থান থেকে আগত লোকেরা এর প্রতি দৃষ্টি রাখুন।

*** ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই আপনারা নিজ নিজ স্থানে নিজেদের দেশে ফিরে যান। যাদের বিশেষভাবে জলসার ভিসা লাভ হয়েছে তাদের তো এ বিষয় কঠোরতার সাথে পালন করা উচিত। এ বিধি-নিষেধ পালন না করলে জামাতী ব্যবস্থাপনাও ক্রিয়াশীল হতে বাধ্য হবে।**

* পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্যে বিশেষভাবে যেখানে বেশি ভীড় হয় স্থান সংকীর্ণ হলে আর স্বল্প জায়গায় সাময়িক ব্যবস্থা করা হলে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তাই টয়েলেট প্রভৃতি পরিষ্কার রাখার প্রতি সবারই বিশেষ দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। কোন কর্মী না থাকলেও এবং কেউ টয়েলেট ব্যবহার করতে গেলে নিজে পরিষ্কার করে নেয়াতে কোন দোষ নেই। একে অপরের সাহায্য করার মাঝে কোন দোষ হতে পারে না। আপষে ভাই ভাই হলে এমন কাজ করে নেয়া উচিত। এটা হওয়া উচিত নয় যে,কর্মী আসবে তখনই পরিষ্কার হবে। আমি এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করবো এবং ব্যবস্থাপনা তাকে জবাবদিহি করবে তখনই পরিষ্কার হবে। বরং ছোট-খাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন হলে তা করে নেয়া আবশ্যক। কেননা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রসঙ্গে এসেছে, এটা ঈমানের অর্ধেক।

*মহিলারা ঘোরাফেরা করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করবে এবং পর্দার ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। কিন্তু কখনও কখনও অন্যান্য মহিলারাও এসে থাকেন। তারাও ততটা পর্দার ধার ধারেন না। লোকেরা মনে করে জলসায় আগমনকারী সারাটা মহিলা আহমদী। কিন্তু কখনও অন্য মহিলারাও এসে থাকেন। জামাতের বাইরের মহিলারা তো সেই বিধি-নিষেধ পালন করেন না। তাই ব্যবস্থাপনার এ দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার যেন মহিলা ও পুরুষের ভীড়ের সময় রাস্তা পৃথক পৃথক হয়ে যায়।

* ছোট ছোট শিশুদের মাঝেও এসব দিনে বিশেষভাবে জামাতী রীতি-নীতর প্রতি দৃষ্টি রাখতে গিয়ে টুপী পরার অভ্যাস সৃষ্টি করুন। এমনসব শিশু যারা নামায পড়ার বয়সে পৌঁছে গিয়েছে আর এভাবে এমন সব বালিকারা যাদেরও এমন বয়স হয়েছে তাদে মাথায় ছোট আকারের ওড়নাও এনে দেয়া উচিত।

* কখনও কখনও অভিযোগ উত্থাপিত হয়। এরা খুবই সাধারণ, এক আধটা এমন কেস হয়ে থাকবে, কোন কোন লিফট দানকারী মেহমানদের কাছ থেকে টাকা চেয়ে থাকে। এটা হওয়া উচিত নয়। মেহমানদের সম্মান ও সেবার প্রসঙ্গে আমি আগেই বলেছি। একে বিশেষ গুরুত্ব দিন। ভালবাসা, নিষ্ঠা, পরোপকার ও কুরবানীর আবেগের সাথে তাদের সেবা করুন। এরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মেহমান। তাদের সাথে কোমল ও আনন্দচিত্তে কথা বলুন। এ বিস্তারিত পথ-নির্দেশনা আমি আগেই দিয়েছি।

* মেহমানরা আসছে তারাও এদিকে দৃষ্টি রাখুন। ব্যবস্থাদির প্রতি দৃষ্টি রাখুন। জলসার ব্যবস্থাপকগণের সাথে পুরোপুরি সহযোগিতা করুন। সব দিক থেকে তাদের প্রতি আনুগত্য করুন।

* কোন কোন মা নিজ সন্তানের জন্যে খুবই আত্মাভিমান পোষণ করে থাকেন। কোন কর্তব্যরত লোক কাউকে কিছু বলে ফেল্লে মারা মারি করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায়। তারাও শুনে নিন, যদি সহযোগিতা করতে না পারেন আর এতই আত্মাভিমান থাকে তাহলে জলসার সময় এ মারকীতে আসবেন না।

* খাবার খাওয়ার সময়ও কোন কোন বিষয় দৃষ্টিতে আসে। কখনও কখনও নষ্ট হয়ে যায়। এবার তারা ব্যবস্থাপনায় রদবদল করেছে। কেননা, প্রথমেই প্যাকিং করে দিয়ে থাকতো আর আমি দেখেছি, এতটা পরিমাণ যে, মনে হয় নষ্ট হবে না। সাধারণত এক ব্যক্তি এতটা খেয়ে নিবে। কিন্তু কোন কোন লোকের কোন কোন খাবার খাওয়ার অভ্যেস নেই। এখন আলু পসন্দ না হলেও বাধ্য হয়ে খেয়ে নিন নষ্ট করবেন না। কেননা, পরে এখানে ঢের করে রাখা বড়ই কষ্টকর।

* কখনও কখনও পরস্পরে ঠাট্টা-মস্করা করে ছোট ছোট কথা বলা হয়ে থাক। এগুলোও কখনও কখনও বিরাট ঝগড়া ও মারামারির

আকার ধারণ করে। এগুলো থেকেও বিরত থাকুন, পরিহার করুন। কথায় কোমলতা খুবই প্রয়োজন। মু'মিন ও অতিথি সেবক উভয়েই এ দিকে দৃষ্টি দিন। কোমল ভাষা ব্যবহার করুন। কোন পক্ষ থেকেই কঠোর ভাষা ব্যবহৃত হওয়া উচিত নয়। প্রেম ও ভালবাসার সাথে পরস্পরে এসব দিনে সাক্ষাৎ করুন বরং সব সময় এভাবেই করুন আর বিশেষভাবে যেভাবে আমি প্রথমে বলেছি, এসব দিনে দোয়ার মাধ্যমে কাটান। জলসার যে বিশেষ কল্যাণ তা লাভ করার চেষ্টা করুন।

* হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর উদ্ধৃতিতে আমি প্রথমে এটা বলেছিলাম, এটা জামাতী জলসা। এটাকে মেলা মনে করবেন না। কেননা, আপসে দেখা সাক্ষাৎ বা ফেশান প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এটা নয়। মহিলারা একান্তে হলে কথা বলা শুরু করে দেয় আর শেষ হতেই চায় না। তাদেরও সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। ব্যবস্থাপকগণ এর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখুন এবং তত্ত্বাবধান করুন।

আল্লাহ্‌তাআলার অনুগ্রহে বিশ্বের প্রত্যেক দেশে যেখানে যেখানেই জলসা হয়ে থাকে এসব বিষয়ের প্রতি এখন দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

বাইর থেকে আগমনকারী কোন কোন লোক কেনাকাটা করার জন্যে কর্জ নেয়ার চেষ্টা করে থাকে। এ বিষয়ে স্বল্পেতুষ্টতার গুণকে ভূলুণ্ঠিত করে। স্বল্পেতুষ্টতার গুণের বদলে এমনটি প্রকাশ পেয়ে থাকে যা মানুষের কাছে ভাল লাগে না। তাই একে পরিহার করা উচিত। যতটা সৌভাগ্য লাভ হয় এতটাই ব্যয় করুন। যেভাবে আমি বলেছি, কেনাকাটা করার জন্যে যতটা অর্থ আপনার পকেটে রয়েছে ততটা দিয়েই কেনাকাটা করুন। বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে কর্জ নিবেন না। এটা বড়ই ভুল পদ্ধতি। জলসা শুনা আবশ্যক আর যে আধ্যাত্মিক খাবার এখানে বিতরণ হচ্ছে এতে সবারই ঝুলি ভরে নেয়া উচিত। যদিও এটা বলা হয়, মেহমানদারী ৩ দিনের জন্যে। কিন্তু কোন কোন লোক দূর-দূরান্ত থেকে আসেন, অর্থ ব্যয় করে আসেন আবার এটা মনে করে থাকেন, দ্বিতীয়বার আসার সুযোগ হয় কিনা তাই অধিক সময় থাকতে চান। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের কাছে যদি থাকতে চান তাহলে তাদের খুশী মত থাকতে দোষ নেই। আর কোন কোন লোক খুবই অনুভূতিপ্রবণ হয়ে থাকে যারা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কিছুটা কম স্বচ্ছল বা নিকটাত্মীয় এমন মেহমানকে তিন দিন হয়ে গেছে মেহমানদারী শেষ ঠাট্টাচ্ছলেও আবেগপ্রবণ করা উচিত নয়। এভাবে তাদের সাথে দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যায়।

নিরাপত্তার দিক থেকেও বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। নিজের পরিবেশের ওপর গভীর দৃষ্টি রাখুন। এটা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। অপরিচিত ব্যক্তি বা যাকে সন্দেহ হয় এমন কোন ব্যক্তি আপনার দৃষ্টিতে পড়লে তখন সংশ্লিষ্ট বিভাগকে সংবাদ দিন। কিন্তু স্বয়ং নিজে কারও সাথে এমন আচরণ করবেন না যার সাথে কোন প্রকার কথা কাটাকাটির সমস্যা সৃষ্টি হয় এবং পরে মারামারির অবস্থা সৃষ্টি হয়। কিন্তু সংবাদ দেয়ার সময় না থাকলে পরে এর উত্তম অবস্থা এটাই যে, আপনি এ ব্যক্তির পেছনে সাথে সাথে থাকুন, তার কাছাকাছি থাকুন। তাই প্রত্যেক ব্যক্তি এভাবে নিরাপত্তার দৃষ্টিতে দেখতে থাকুন। অনেক সমস্যা তো এভাবেই সমাধা হয়ে যেতে পারে। কখনও কখনও কোন কোন সংবাদের ভিত্তিতে, বিগত বছরগুলোতে আসতে থাকতো, ব্যবস্থাপনা কঠোরভাবে চেক করতো। তাই এমন কোন অবস্থার যদি সৃষ্টি হয়ে যায়, কড়াকড়িভাবে চেক করা হয় তাহলে পরিপূর্ণভাবে সহযোগিতা করা আবশ্যক; বিশেষ করে মহিলাদেরকে। তারা সাধারণভাবে অস্থির হয়ে পড়ে। তাই আমাদের সুরক্ষার দৃষ্টি থেকেই এ সব কিছু হয়ে থাকে। এজন্যে সকলের সহযোগিতা অবশ্য-করণীয়।

নিরাপত্তার দিক থেকেও বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। নিজের পরিবেশের ওপর গভীর দৃষ্টি রাখুন। এটা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। অপরিচিত ব্যক্তি বা যাকে সন্দেহ হয় এমন কোন ব্যক্তি আপনার দৃষ্টিতে পড়লে তখন সংশ্লিষ্ট বিভাগকে সংবাদ দিন। কিন্তু স্বয়ং নিজে কারও সাথে এমন আচরণ করবেন না যার সাথে কোন প্রকার কথা কাটাকাটির সমস্যা সৃষ্টি হয় এবং পরে মারামারির অবস্থা সৃষ্টি হয়।

আবার আর একটি বিষয় এই, আপনাদেরকে যে কার্ড দেয়া হয়েছে তা আপনাদের কাছে রাখুন। কারও কার্ড হারিয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে অবহিত করুন। কোন কার্ডটি হারিয়ে গেছে যেন তারাও জানতে পারে। কার কার্ডটি হারিয়ে গেছে (তা-ও জানতে পারে)যেন অন্য কেউ সেই কার্ডটি লাগিয়ে থাকলে তা-ও জানা যায় আর আপনাকেও একটি নতুন কার্ড সরবরাহ করা হয়।

মূল্যবান জিনিষপত্র ও নগদ টাকা-পয়সার হেফাযত করাও আপনার দায়িত্ব এবং স্বয়ং তা করুন। কেননা, এখানে অনেক লোক এসে গেছে এবং খোলা জায়গায় তাবুতে সম্মিলিত থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরে যেন কোন অভিযোগ না উঠে। এজন্যে স্বয়ং আপনার সুরক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত।

আল্লাহ্‌তাআলা করুন হযরত আকদস মসীহ মাওউদ (আঃ) এ জলসার উদ্দেশ্যে যে দোয়া করেছেন আমরা যেন তা লাভ করতে পারি আর সেসব উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারি যার জন্যে তিনি জলসার সূচনা করেছিলেন আর এসব দিনে আমাদের দোয়া করার সৌভাগ্য লাভ হয় এবং আল্লাহ্‌তাআলার নৈকট্য লাভেরও সৌভগ্য লাভ হয়।

(দৈনিক আল্ ফযল, রাবওয়া ১৬-২-২০০৫ তারিখের সংখ্যার সৌজন্যে)

অনুবাদ– **আলহাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান**

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) মানব চরিত্রের উত্তম নমুনা প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হয়েছেন । তাঁর (সঃ) ওপর আল্লাহ্‌র হাজার সালাম ও রহমত বর্ষিত হোক ।

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মেনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) কর্তৃক ১৭ই ডিসেম্বর ২০০৪ইং তারিখে মসজিদ বায়তুল ফুতূহ্ লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ, তাআব্বুয, সূরা ফাতিহা ও সূরা আহযাবের আয়াতঃ ২২ তেলাওয়াত করে হুযূর (আইঃ) খুতবা এরশাদ করেছেন

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

"অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে, প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ্ এবং পরকালের আশা রাখে এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে" (আহযাব ঃ ২২) ।

হযরত আয়েশা (রাঃ) কারো প্রশ্নে উত্তর দিলেন যে তোমরা যারা আঁ হযরত (সঃ) এর উত্তম চরিত্র সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞেস করছ কুরআন করীম কি পড়নি, এই জমিন ও আকাশের সৃষ্টিকারী খোদার সাক্ষী যথেষ্ট নয়? ইন্নাকা লাআলা খুলুকীন আযীম অর্থঃ হে রসূল! নিশ্চয় তুমি সর্বোত্তম চরিত্রের মর্যাদায়" । নমুনা তো তারাই বানায় যারা কোন জিনিসের সর্বোচ্চ মর্যাদায় থেকে সর্বোত্তম নমুনা কায়েম করে থাকেন । দুনিয়াতে কোন এক অথবা দুই জিনিসের মধ্যে কোন ভাল নমুনা অর্জন করলে তার উদাহরণ দেয়া হয় এবং সেই নমুনাও এমনটি হয় না যাকে বলা যায় যে, তা সবার ওপরে । আঁ হযরত (সঃ) সম্বন্ধে তো আল্লাহ্‌তআলা বলেন যে, এ নবী সব বিষয়ে সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত । যদিও সেটা ঘরোয়া বিষয় হোক অথবা জাতিগত অথবা গোষ্ঠীগত বিষয় হোক অথবা সর্বোত্তম অধ্যাত্মিক বিষয় হোক, আল্লাহ্‌তাআলার নৈকট্য পাওয়ার কথা হোক । এটিই এক নমুনা যা তোমাদের জন্য উত্তম দৃষ্টান্ত । এ জন্য প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যার আল্লাহ্‌তাআলার সত্ত্বার ওপর বিশ্বাস আছে, এ বিষয়ের ওপর বিশ্বাস রাখে যে পরকালের একটি দিন নির্দিষ্ট আছে যেখানে তার হিসাব-নিকাশ হবে এবং তাঁর প্রস্তুতির জন্য সে যেন বেশি বেশি আল্লাহ্‌তাআলাকে স্মরণ করে । তাঁর ইবাদত করলে তাঁকে আবার ঐ রাস্তায় চলতে হবে যার ওপর আঁ হযরত (সঃ) চলাচল করে দেখিয়েছেন । তখনই আল্লাহ্ তোমাদের সেই দোয়াগুলি এবং তাঁর নৈকট্য অর্জনের ইচ্ছার ওপরও দৃষ্টি দিবেন । এজন্য ঐ রাস্তাকে খোঁজ এবং খোঁজাতেই রত থাক যে, সেটা কোন ধরনের রাস্তা যার ওপর আল্লাহ্‌র এই নবী চলতেন । আঁ হযরত (সঃ) এর যে, উচ্চ মর্যাদা সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত তিনি (সঃ) প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা তো কখনোই পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করা যাবে না । কিন্তু সেই দৃষ্টান্তের ওপর চলার কিছু উদাহরণ সাধারণতঃ পেশ করা হয় । তার মধ্য থেকে কিছু উদাহরণ এ সময় নিব । কিন্তু এ উদাহরণের মধ্যেও শুধু একটি চরিত্রের সম্বন্ধে আমি বর্ণনা করব যে, দুর্বল এবং অসহায়দের সাথে তিনি (সঃ) কেমন ব্যবহার করতেন । কিন্তু সেই কথা যেমনটি আমি বলেছি রেওয়াতের মাধ্যমে আমার নিকট পৌছেছে হয়ত তা আসল এর কোটি ভাগের এক ভাগও নয় । কিন্তু যাই হোক কিছু রেওয়াত আমি উপস্থাপন করছি । কিন্তু এর পূর্বে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব । কেননা তিনিই যিনি সবচেয়ে বেশি আঁ হযরত (সঃ) এর মর্যাদাকে বুঝেছেন ।

হযরত (আঃ) বলেন যে, "সেই মানুষ যিনি তাঁর রূহানিয়াতে এবং পবিত্র শক্তিতে পূর্ণ বেগে ধাবমান নদীর ন্যায় জ্ঞানের দিক থেকে, কাজের দিক থেকেএবং প্রমাণের দিক থেকে পরিপূর্ণ নমুনা দেখিয়েছেন এবং যাকে পরিপূর্ণ নমুনা বলা হয়েছে তিনি বরকতমন্ডিত নবী হযরত খাতামুল আম্বিয়া, খাতামুল মুরসালীন, নবীদের গৌরব হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) । হে প্রিয় খোদা! এই প্রিয় নবীর ওপর এমন রহমত ও শান্তি বর্ষণ কর যা দুনিয়ার শুরু থেকে তুমি কারো ওপর প্রেরণ কর নাই ।

(ইতমামুল হুজ্জত রূহানী খাযায়েন, পৃষ্ঠা ৩০৮)

তাহলে দেখ এই হলো হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর কালাম । কত সুন্দর ভাবে তাঁর প্রভুর গুণ বর্ণনা করেছেন । তারপরেও যদি কেউ বলে যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

আঁ হযরত (সঃ) এর মর্যাদাকে প্রকাশ করতে পারেন নি তা'হলে তাকে জ্ঞান শূণ্য ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন, এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী বলেন যে, বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে, এবং কথা, কর্মকান্ড এবং সমস্ত শক্তির দিক থেকে আঁ হযরত (সঃ) নমুন যাঁর অনুসরণ করা আমাদের জন্য জরুরী এবং সেটাই সর্বোত্তম নমুনা যা থেকে উন্নত আর কোন নমুনা হতে পরে না। কেননা আল্লাহ্‌তাআলার বৈশিষ্ট্য মনুষ্যশক্তির দিক থেকে যদি কোন মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম মর্যাদায় প্রকাশিত হয়ে থাকে তাহলে সেটাও শুধু আঁ হযরত (সঃ) এরই আছে।

এক হাদীসে এসেছে, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন যে, আল্লাহ্‌তআলা আদম (আঃ)কে তাঁর আকারে সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ তাকে তাঁর বৈশিষ্ট্যের প্রকাশক বানিয়েছেন এবং তাতে এই পারদর্শিতা ও খোদাতআলা রেখেছেন যে, তিনি আল্লাহ্‌তাআলার বৈশিষ্ট্যকে রূপকভাবে নিজের মধ্যে আয়ত্ব করতে পারেন। যেমনটি আমি বলেছি, সবচাইতে উত্তম নমুনা আঁ হযরত (সঃ) এর। এই পারদর্শিতা এবং যোগ্যতা আল্লাহ্‌তাআলা সবচেয়ে বেশি আঁ হযরত (সঃ) এর মধ্যে রেখেছেন এবং যদি কোন মানুষ আল্লাহ্‌তাআলার এই বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণ নমুনা দেখতে পারে তবে সে আঁ হযরত (সঃ) এর সত্ত্বা। এই বিষয়ে তিনি (সঃ) নিজে বলেছেন যে, "উত্তম চরিত্রের পূর্ণতার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে" অর্থাৎ আমি উত্তম এবং সর্বোচ্চ আখলাকের (চরিত্রের) পূর্ণতার জন্য প্রেরিত হয়েছি। পূর্ণতাতো তার মধ্যে হতে পারে যে নিজে সকল বৈশিষ্ট্য এবং আখলাকে (চরিত্রে) পরিপূর্ণ। সুতরাং এই পূর্ণমানব এর উম্মতে প্রবেশ হওয়ার দাবীকারক প্রত্যেক ব্যক্তির এটা ফরয হয়ে যায় যে, তাঁর চরিত্রকে অবলম্বন করে তাঁর (সঃ) প্রেরণের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ কর। আর আজ এই কর্তব্য সবচেয়ে বেশি জামাতে আহমদীয়ার প্রত্যেক ব্যক্তির উপর অর্পিত হয়েছে। যেমনটি আমি বলেছিলাম যে, তাঁর (সঃ) এক চরিত্র যা দুর্বল, গরীবদের, সাথে তাঁর আচার-আচরণে তিনি প্রদর্শন করেছেন তার মধ্য থেকে কিছু উপস্থাপন করব।

আর তা হলো এই যে, তাঁর হৃদয়ে এই নিরুপায় ও দুর্বল প্রকৃতির জন্য ভালবাসার যে আবেগের জ্যোতি দেখা যায়। হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিন আবি আওফ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সঃ) এর মধ্যে বিন্দুমাত্রও অহংকার ছিল না। তিনি (সঃ) নাক উঁচু করতেন না। এই বিষয়কে মন্দ মনে করতেন ও এর থেকে বেঁচে চলতেন।

অসহায় মহিলা, মিসকিন এবং গরীবদের সাহায্যের জন্য প্রতি মুহূর্তে প্রস্তুত থাকতেন এবং এতে আনন্দ বোধ করতেন এবং এটা শুধু তাঁর (সঃ) জীবনের প্রাথমিক যুগের কথা নয় বরং যখন বিজয়ের পর বিজয় লাভ করছিলেন, তখনও তাঁর (সঃ) আখলাকের এমনই সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত ছিল,

তিনি (সঃ) বিধবা ও মিসকিনদের সাথে কথা বলতেন, তাদের কাজ করতেন, তাদের সর্বপ্রকার সাহায্য করতেন"। (সুনান দারমী)

অর্থাৎ অসহায় মহিলা, মিসকিন এবং গরীবদের সাহায্যের জন্য প্রতি মুহূর্তে প্রস্তুত থাকতেন এবং এতে আনন্দ বোধ করতেন এবং এটা শুধু তাঁর (সঃ) জীবনের প্রাথমিক যুগের কথা নয় বরং যখন বিজয়ের পর বিজয় লাভ করছিলেন, তখনও তাঁর (সঃ) আখলাকের এমনই সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত ছিল, এমনই পন্থা ছিল।

সুতরাং তাঁর (সঃ) দৃষ্টিতে অসহায়দের এবং মিসকিনদের কেমন মর্যাদা ছিল এই সম্বন্ধে হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সঃ) এই দোয়া করতেন যে, "হে আল্লাহ্‌ ! আমাকে মিসকিন অবস্থায় জীবিত রাখ এবং মিসকিন অবস্থায় মৃত্যু দাও এবং আমাকে কেয়ামতের দিনেও মিসকিনদের দলে রেখ। এতে হযরত আয়েশা (রাঃ) আরজ করলেন যে কেন হে আল্লাহ্‌র রসূল? এতে আঁ হযরত (সঃ) বললেন, মিসকিনরা ধনীদের থেকে চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে"। অর্থাৎ তাদের মধ্যে অহংকার এবং গর্ব বেশি থাকে না। অসহায়ত্ব এবং নম্রতা থাকে। এজন্য আল্লাহ্‌তাআলা তাদের সম্মান বাড়িয়ে দেন। "হে আয়েশা! কোন মিসকিনকে তিরস্কার করো না যদিও তোমাকে একটি খেজুরের টুকরা দিতে হয়। হে আয়েশা! মিসকিনদেরকে নিজের প্রিয়জনদের মত রাখ এবং তাদেরকে নিজ নজরে আরামের সাথে রাখ। খোদাতাআলা কেয়ামতের দিন তোমাকে তাঁর কাছে আরামের সাথে রাখবেন। (তিরমিযী কিতাবুয্ যোহ্‌দ)

তাহলে দেখুন, সমাজে বাহ্যিক দুর্বল প্রকৃতির জন্য কেমন ভালবাসা এবং সহানুভূতির আবেগ রয়েছে। কিন্তু এই দোয়ার বাক্যাবলী উচ্চারণ করে দুনিয়ার দৃষ্টিতে এই দুর্বল প্রকৃতিকে কত উচ্চ মর্যদা দিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং দেখনু, এটা শুধু দোয়া বা নিজের ঘরের মানুষের জন্য নসিহতই নয় বরং এতে আমল করেও দেখিয়েছেন এবং এই আমল এবং নমুনা সাহাবাদের দৃষ্টিতে পড়ত।

হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিন আবি আওফাও এটাই বর্ণনা করেছেন যে, আঁ হযরত (সঃ) অহংকার করতেন না এবং বিধবাগণ ও মিসকিনদের সাথে চলতে এবং তাদের কাজ করতে সংকোচ বোধ করতেন না।

তিনি (সঃ) অধিনস্থদের প্রতি নম্রতা দেখাতেন, সেবকদের প্রতি মেহেরবানী করতেন এ সম্বন্ধে হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'আমি ছোট ছিলাম এবং দশ বছর পর্যন্ত আমার হুযূর (সঃ)এর খেদমতের

সুযোগ হয়েছে এবং আমি ঐভাবে কাজ করতে পারতাম না যেভাবে হুযূর (সঃ) চাইতেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এমন হোত। কিন্তু তিনি (সঃ) কখনোই আমাকে কাজের বিষয়ে কিছুই বলেন নাই। কোনদিন আহঃ পর্যন্ত বলেন নাই। অথবা এটা কখনোই বলেন নি যে, তুমি এটা কেন করেছ, অথবা তুমি এটা কেন কর নাই অথবা এটা এভাবে কর নাই? কখনোই তিনি (সঃ) কিছু বলেন নাই। (সুনানে আবুদাউদ বাবুল আদব ফিল হিলমে ওয়াল আখলাকেন্নবী)।

হযরত আনাস (রাঃ) আরেকটি বর্ণনা করেন। রসূল করীম (সঃ) সমস্ত লোকদের থেকে উত্তম আখলাকের অধিকারী ছিলেন। একবার তিনি (সঃ) আমাকে কোন কাজের জন্য পাঠালেন আমি বললাম আমি যাব না। কিন্তু আমার মনে ছিল যে, ঐ কাজে যাব এবং এখনই করে আসব কেননা এটি হুযূর (সঃ) এর আদেশ। আমি যাচ্ছিলাম। ছোট ছিলাম। তাই বাজারে বাচ্চাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। ছোট ছেলেরা খেলছিল। আমি দাড়িয়ে গেলাম এবং তাদেরকে দেখতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে আঁ হযরত (সঃ) আসলেন এবং পিছন থেকে আমার কাঁধের ওপর হাত রাখলেন। আমি ঘুরে তাঁর (সঃ) এর দিকে দেখলাম। তকিয়ে দেখলাম তিনি হাসছিলেন। বললেন, "উনায়েস! (মজা করলেন)। যে কাজের জন্য তোমাকে পাঠানো হয়েছিল সেখানে গিয়েছিলে? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! এখনই যাচ্ছি। আনাস বলেছেন, খোদার কসম আমি ৯/১০ বছর পর্যন্ত হুযূর (সঃ) এর খেদমত করেছি, আমার মনে নেই যে, তিনি (সঃ) কখনো বলেছেন যে, তুমি এ কাজ কেন করেছ? অথবা কোন কাজ না করলে তিনি (সঃ) বলেন নি যে কেন কর নাই? (মুসলিম কিতাবুল ফাযায়েল)

রসূল (সঃ) নিজ খাদেমদের এবং অধিনস্থদের সাথে যে উত্তম ব্যবহার করেছেন তার বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, "আল্লাহ্‌তাআলা অনেক রহীম এবং করীম। তিনি প্রত্যেকভাবে সব সময় মানুষের প্রতিপালন করেন এবং তারপর রহম করেন এবং সেই রহমের কারণে মা'মুরদের পাঠান যেন তিনি জগদ্বাসীকে অপবিত্র গুনাহ্‌র জীবন থেকে মুক্তি দেন"।

তিনি আরো বলেন, মু'মিনের শর্ত এই যে, তার মাঝে অহংকার যেন না থাকে এবং আনুগত্য, বিনয় ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে যেন পাওয়া যায় এবং এটা খোদাতাআলার মামুরদের বৈশিষ্ট্য। তার মাঝে আনুগত্য এবং বিনয় চরম সীমা পর্যন্ত থাকে এবং

মু'মিনের শর্ত এই যে, তার মাঝে অহংকার যেন না থাকে এবং আনুগত্য, বিনয় ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে যেন পাওয়া যায় এবং এটা খোদাতাআলার মামুরদের বৈশিষ্ট্য।

সবচেয়ে বেশি আঁ হযরত (সঃ) এর মাঝে এই গুণ ছিল। তাঁর (সঃ)-এর এক খাদেমকে জিজ্ঞেস করা হল যে, তোমার সাথে তাঁর (সঃ) কি সম্পর্ক। সে বলেছে সত্য কথা এই যে, আমি যতটুকু খেদমত করেছি তার চেয়ে বেশি তিনি আমার খেদমত করেছেন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদীন ওয়া আলা আলি মুহাম্মদীন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।

হযরত (আঃ) বলেছেন, "এই হলো সর্বোত্তম আখলাক এবং বিনয়ের দৃষ্টান্ত এবং একথাও সত্য যে, অনুচরবর্গ বেশি সম্মানিত হন যারা সব সময় পাশে প্রস্তুত হয়ে থাকেন। এ জন্য যদি কারো বিনয়, আনুগত্য ধৈর্য ও সহ্যের নমুনা দেখতে চাও তাহলে তার কাছ থেকে জানা যেতে পারে। এর পর বলেন, আজকাল কি হয়? কিছু পুরুষ এবং মহিলারা এমন হয় যে কর্মচারীদের দ্বারা যদি কোন কাজ নষ্ট হয় যেমন চা এর মধ্যে সমস্যা হলে তৎক্ষণাৎ গালি শুরু করে দেয় অথবা চাবুক নিয়ে মার শুরু করে দেয়। "অর্থাৎ কোন জিনিস নিয়ে মারা শুরু করে দেয়। ঝোলের মধ্যে সামান্য লবণ বেশি হলে তো নিরিহ কর্মীদের বিপদ এসে যায়। (মলফূযাত, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৩৭-৪৩৮)

যদি কখনো কোন গরীব অথবা খাদেমের উপর যুলুম হতে তিনি (সঃ) দেখতেন তবে তাঁর (সঃ) হৃদয় ছটফট করতো। ঐ জামানায় দাস কেনা যেতো এবং মালিকানা অধিকার ও প্রভুত্ব তার হয়ে যেতো এবং তার সত্ত্বার উপর পরিপূর্ণ অধিকার এবং জোর জবরদস্তির অধিকারী হয়ে যেত। রীতি অনুযায়ী ইসলামের পূর্বে তো গোলামদের যুলুমের চরম পর্যায়ে রাখা হোত। এবং কোন সময় তো জানোয়ারদের চেয়েও অনেক নিচ ব্যবহার করা হত। গোলামদেরকে যিনি মানুষের সম্মান ও মর্যাদা দান করেছে তিনি আঁ হযরত (সঃ)। এ সম্বন্ধে একটি বর্ণনা এসেছে, আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) বলেন, আমি আমার এক গোলামকে মারছিলাম (কোন বিষয়ে কিছু হয়তো ভুল করেছিল) আমি আমার পিছন থেকে এক কণ্ঠস্বর শুনলাম যা এই ছিল, হে ইবনে মাসউদ! শুনে রাখ যে আল্লাহ্‌তাআলা তোমার ওপর তার চেয়ে বেশি শক্তি রাখেন, যতটুকু তুমি ঐ গোলামের ওপর রাখ। আমি ঘুরে দেখলাম রসূলুল্লাহ্ (সঃ)। সুতরাং আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি তাকে আল্লাহ্‌র খাতিরে মুক্তি দিলাম। তাতে রসূল (সঃ) বললেনঃ 'যদি তুমি তাঁকে মুক্তি না দিতে তাহলে তুমি দোযখের আযাবে পড়ে যেতে"। (মুসলিম কিতাবুল ঈমান) তাহলে দেখুন, এক গোলামকে মারতে দেখে হুযূর (সঃ) এর হৃদয় কিভাবে ছটফট করেছে। তিনি (সঃ) এটা বলেন নাই যে, দেখ ঐ গোলামের দোষ কি ছিল যাকে মারা হচ্ছিল। জায়েযভাবে মার পড়ছে বা নাজায়েযভাবে। বরং গোলামকে মারতে দেখা মাত্রই তিনি (সঃ) সহ্য করতে পারলেন না। সাহাবাগণও

তাঁর (সঃ) মেজায বুঝতেন। এই জন্য আবু মাসউদ (রাঃ) তৎক্ষণাৎ বললেন, আমি তাকে মুক্তি দিচ্ছি। তিনি (রাঃ) বুঝালেন যে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার এটি একটি উপায় যে, এই গোলামকে মুক্তি দাও।' তো এভাবেই গোলামদের সাথে ব্যবহার করতেন এবং তাদের মুক্তি দেওয়াতেন। তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতেন আর তাদের আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠিত করতেন।

তিনি (সঃ) অন্যের সন্তানদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করতেন। সাধারণভাবে লোকেরা নিজেদের শিশুদের সাথে তো মহব্বত করে কিন্তু অন্যান্য শিশুদের উপেক্ষা করা হয়ে থাকে। কিন্তু তিনি (সঃ) তো জাতির প্রত্যেক শিশুকে নিজের শিশু মনে করতেন। হযরত জাবের বিন সামরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর সাথে নামায পড়েছি। তারপর তিনি বাড়ীর দিকে গেলে আমিও তাঁর (সঃ) সাথে ছিলাম। আরো শিশুরাও রসূল (সঃ) কে স্বাগত জানালো আর তিনি (সঃ) সেই বাচ্চাদের প্রত্যেককে পর্যায়ক্রমে গালে হাত দিয়ে আদর করতে লাগলেন। জাবের বিন সামুরা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সঃ) আমার গালেও ভালবাসার হাত রাখলেন। আমি তাঁর (সঃ) হাতের স্নিগ্ধতা এবং সুগন্ধি সেই ভাবে অনুভব করলাম যেন তার (সঃ) হাত এখনই আতরদানী থেকে বের হয়ে এসেছে।" (মুসলিম কিতাবুর ফাযায়েল বাব তিব)

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, উসামা বিন যায়েদ দরজায় ধাক্কা খেলো যাতে তার কপালে জখম হলো। অতএব রসূল (সঃ) আমাকে বললেন, তার যখম পরিষ্কার করে কষ্ট দূর কর। তাই আমি তাঁর যখম দূর করলাম এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন রসূল (সঃ) আবার তাকে আদর দিয়ে স্নেহ দিয়ে বললেন যে, যদি উসামা মেয়ে হত তাহলে আমি তাকে ভাল ভাল কাপড় পড়াতাম এবং আমি তাকে অলংকার পড়াতাম এমনকি আমি তার জন্য অনেক অর্থ খরচ করতাম। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)

এভাবে তাকে খুশী করতে থাকলেন। আর তার হৃদয় জয় করতে থাকলেন। তিনি (সঃ) এটি দেখেন নি যে, গোলামজাদা নাকি গোলামের বেটা নাকি কোন ধনি ব্যক্তির সন্তান। বরং গরীবদের চেয়েও আগে বেড়ে উত্তম ব্যবহার ও ভালবাসার আচরণ করলেন। তারপর উসামা বিন যায়েদ থেকেই আরেকটি বর্ণনা আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আমাকে আঁকড়ে ধরে নিজের এক উরুতে বসিয়ে নিতেন আর অপরটিতে হাসান (রাঃ)কে। অর্থাৎ যখন বসে থাকতেন তখন উরুতে একদিকে হযরত হাসান (রাঃ)কে বসিয়ে নিতেন আর অপরটিতে আমাকে। তারপর আমাদের দু'জনকেই বুকে টেনে নিতেন আর দোয়া করতেন ঃ আল্লাহুম্মা আরহেমাহুমা ফাইন্নি আরহামোহুমা অর্থাৎ হে আল্লাহ্! এই দু'জনের ওপর রহম করো, আমি এ দু'জনকে ভালবাসি। (বুখারী কিতাবুল আদব)

নিজের নাতি আর উসামার মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নি। এটি দেখেন নি যে এটি গোলামের বেটা। এক গরীবের ছেলেকেও সে মর্যাদা দিয়েছেন যা নিজের নাতিকে দিয়েছেন। আর দু'জনের জন্য একই আবেগের সাথে দোয়া করেছেন। বাহ্যিকভাবে কিছু লোক এক রকম ব্যবহার করে কিন্তু যদি দোয়াতে পার্থক্যও হয়ে যায় তাহলে কোন আপত্তির সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু তিনি (সঃ) তো পরিপূর্ণ আদর্শ ছিলেন আর যিনি পরিপূর্ণ আদর্শ হন তিনিই এত ভালভাবে অন্যের খেয়াল রাখতে পারেন যে দোয়াতে কোন পার্থক্য করেন না। এরপর দেখুন গ্রামাঞ্চল থেকে আগত গরীব এবং অতি সাধারণ আকৃতি প্রকৃতির লোকের সাথে কতো প্রেম-ভালবাসা ও তার আত্মসম্মান রক্ষাকারী ব্যবহার ছিল। একটি বর্ণনায় এসেছে হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যাহের নামে এক বেদুইন ব্যক্তি যে গ্রামে বসবাস করত নবী করীম (সঃ) কে উপহার সামগ্রী দিত। যখন সে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করত তখন নবী করীম (সঃ)ও তাঁকে উপহার সামগ্রী দিতেন। তো একবার নবী করীম (সঃ) বললেন, যাহের আমাদের গ্রাম্য বন্ধু আর আমরা তার শহুরে বন্ধু। নবী করীম (সঃ) তাকে ভালবাসতেন যদিও সে অতি সাধারণ চেহারার ছিল। কথিত আছে যে, একদিন ঐ ব্যক্তি বাজারে নিজের জিনিস বিক্রি করছিল। তখন নবী করীম (সঃ) তার পিছন থেকে আসলেন এবং চুপিচুপি তাঁর চোখে হাত রাখলেন। সে রসূল (সঃ) দেখতে পায় নি। সুতরাং সে বলতে লাগল কে? আমাকে ছেড়ে দাও। হয়ত হাত দ্বারা চিনে নিয়েছিলো যে আর কে হাত রাখতে পারে? তিনি (সঃ)-ই হতে পারেন। তখন সে তার (সঃ) নিজের পিছন দিক রসূল (সঃ) এর বুকের সাথে ঘসতে লাগল আর নবী (সঃ) বলতে লাগলেন, এই গোলামকে কে ক্রয় করবে। তখন সে বলল, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনিতো তাহলে খুব সস্তায় পাবেন। আমার মত এক অতি সাধারণ আকৃতির লোককে কে কিনবে? তখন রসূল (সঃ) বললেন, কিন্তু তুমি আল্লাহ্র নিকট খুবই মূল্যবান (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)

সুতরাং দেখুন এক গ্রাম্য সাধারণ আকৃতির লোকের সাথেও কিরূপ হৃদয়বান ছিলেন। প্রথম কথাতো এই যে, বাজারে দাঁড়িয়ে তার সাথে এরূপ ব্যবহার করে সবাইকে এটা বলে দিয়েছেন যে, গরীব বা ধনী, সুন্দর বা খারাপ চেহারা, কম জ্ঞানের বা বেশি জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার কোন পার্থক্য নেই। এখন যদি পার্থক্য কায়েম হয় তাহলে নেকী আর তাকওয়া এর ওপর কায়েম হবে। আর ঐ ব্যক্তিকেও এই শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, নিজের দুর্বল স্বাস্থ্য বা দারিদ্রতাকে নিয়ে চিন্তা করো না। তোমার নেকী এবং দারিদ্রতাই তোমাকে আল্লাহ্তাআলার নিকট অতি উচ্চ মর্যাদার ব্যক্তি বানিয়ে দিয়েছে।

এরপর দেখুন সে এক অশিক্ষিত বেদুইন ছিল। কিন্তু তাঁর (সঃ) নূর দ্বারা আলোকিত হওয়ার পর তাঁর (সঃ) শিক্ষাসমূহ থেকে অংশ পাওয়ার পর তার বুদ্ধি বিবেকেও তীক্ষ্ণতা এসে গেছে আর কত দূর পর্যন্ত

পৌঁছে গেছে। সে চিনে ফেলল যে, এটি রসূল (সঃ)-ই হবেন। এই জন্য সাথে সাথে নিজের শরীরকে তাঁর (সঃ) শরীরের সাথে ঘসতে শুরু করলেন। যে আজ যত বরকত নেওয়ার নিয়ে নাও। একটু চিন্তা করুন ঐ সময় বাজারে দাঁড়ানো বড় বড় লোকেরাও কত আফসোসের সাথে ঐ গ্রাম্য লোককে দেখছিল যে হায়! এখন যদি এই বরকত আমরা লাভ করতে পারতাম।

অতঃপর রসূল (সঃ) এর গরীবদের প্রতি সহনশীলতার একটি উদাহরণ রয়েছে। এটি প্রথমদিকের কথা হবে। গ্রাম বাসীদের ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান ছিল না। না জানার এবং না বুঝার ফলে অনেক সময় ভুল আচরণ করে ফেলত। আর শহরে বসবাসকারী সাহাবাগণ (রাঃ) এর দীর্ঘ সময় তরবীয়ত হয়েছিল, তাঁরা তাদের (গ্রামবাসীদের) ঐ ভুল কাজে রাগান্বিতও হয়ে যেত। কিন্তু আঁ হযরত (সঃ) সবসময় এরূপ ক্ষেত্রে খুব নরম হৃদয়ে ও ধৈর্যের সাথে এ সমস্যা সমাধান করে দিতেন। এক বার এক বেদুইন মসজিদের এক পার্শ্বে আসল আর কিনারায় প্রশ্রাব করে দিল। এতে করে লোকেরা চিৎকার শুরু করে দিল। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) কয়েক বালতি পানি আনলেন আর সে জায়গায় পানি ঢেলে দেয়া হল। যাতে সে জায়গা পরিষ্কার হয়ে যায়। (মুসলিম কিতুবুত্ তাহারাত বাব উজুব গুসলিল বোল, পৃষ্ঠা-৪৫)

এখন দেখুন, তিনি (সঃ) ঐ অবস্থায় তাকে আটকানোও সমীচীন মনে করেন নি। কিন্তু সাথে সাথে নিজের আমল দ্বারা লোকদের এটি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, স্বাচ্ছন্দের সাথে সমস্যা সমাধান হতে পারে। আবার তাঁকেও বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, মসজিদ এমন জায়গা নয় যেখানে নোংরা করা যায়। এটি সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে আর সাথে সাথে পানি ঢেলে দিয়ে তাদের সামনে এ বিষয়টি পরিষ্কার করে দিয়েছেন। এই কয়েকটি উদাহরণ আমি পেশ করলাম রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর নমুনার, তাঁর (সঃ) সুন্দর আচরণের যা সমাজের দুর্বল শ্রেণীর সাথে তাঁর (সঃ) ছিল। এই নমুনা যা তিনি (সঃ) কায়েম করেছেন এটি এজন্য ছিল যে, তাঁর উম্মত যেন এ উচ্চ মানদন্ডের উপর কায়েম হয়ে নিজেদের আদর্শের মানদন্ডকে উচ্চ করে। এজন্যই তো তিনি (সঃ) বলেছেন যে, আমার আবির্ভাবের উদ্দেশ্য এই উচ্চ আখলাককে পরিপূর্ণ করা। তিনি (সঃ) চাইতেন না যে, তাঁর (সঃ) উম্মতের কোন একটি ব্যক্তিও আল্লাহ্‌র অপছন্দনীয় হয়।

এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি (সঃ) বলেছেন, সমগ্র সৃষ্টিই আল্লাহ্‌তাআলার পরিবার। তাই আল্লাহ্‌তআলার নিকট তার সৃষ্টির মধ্যে থেকে ঐ ব্যক্তিই খুব পছন্দনীয় যে, তার পরিবারের সাথে ভাল ব্যবহার করে। অর্থাৎ তার সৃষ্টির সাথে ভাল ব্যবহার করে আর তাদের প্রয়োজনীয়তার ওপর দৃষ্টি রাখে।

> "যদি আল্লাহ্‌তাআলাকে খুজতে চাও তাহলে মিসকিনদের হৃদয়ে খোঁজ। এজন্যই পয়গাম্বরগণ মিসকিন এর জামা পরিধান করেছিলেন। এজন্যই বড় জাতির লোকদের ছোট জাতির লোকদের প্রতি হাসি তামাশা করা উচিত নয়। আর কেউ যেন না বলে যে আমার বংশ বড়। আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, তোমরা যখন আমার কাছে আসবে তখন এই প্রশ্ন করব না যে তোমার জাতি কি? বরং এই প্রশ্ন করব তোমার আমল কি?

দুর্বলদের হক (প্রাপ্য) সম্পর্কে তিনি (সঃ) তাঁর উম্মতকে যে সকল নসিহত করেছেন এখন সেগুলোরও কতিপয় দৃষ্টান্ত পেশ করছি–

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আঁ হযরত (সঃ) বর্ণনা করেছেন আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন যে, তিন ব্যক্তি এমন যাদের আমি কেয়ামতের দিন পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ করব। এক সেই ব্যক্তি যে আমার নামে কাউকে নিরাপত্তা দিয়েছে আর বেঈমানী করেছে। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি যে, এক স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রয় করে তার মূল্য খেয়ে নিয়েছে। আর তৃতীয় ঐ ব্যক্তি যে, কাউকে মজদুরীর জন্য রেখেছে আর তার থেকে পুরোপুরি কাজ নিয়েছে আর তাকে পুরো পারিশ্রমিক দেয় নি। অর্থাৎ, শ্রমিকের পরিশ্রমের প্রতিদান দেয়নি, কাজের প্রতিদান দেয় নি। (বুখারী কিতাবুল বুয়ু)

এই স্বভাব আমাদের সমাজে কিছু লোকের মধ্যে দেখা যায়। হয় কাজ করানোর পূর্বে এই শর্ত রাখতে হবে যে যদি কাজ এইরূপ না হয় আর এই এই জিনিস না হয় তাহলে আমি মূল্য এত কম দিব আর যদি এরূপ না হয় তাহলে কাজ হয়ে যাওয়ার পর কারও পারিশ্রমিক মেরে দেওয়ার জন্য বাহানা খোজা উচিৎ নয়। কেননা তিনি (সঃ) বলেছেন যে, আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন যে, আমি এরূপ ব্যক্তির থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নিব। তাই আল্লাহ্‌তাআলার জিজ্ঞাসাবাদকে ভয় করা উচিত।

আর এক বর্ণনায় এসেছে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলছেন, রহমকারীদের ওপর রহমান খোদা রহম করেন। তোমরা দুনিয়াবাসীদের ওপর রহম কর তাহলে আসমানে যিনি আছেন তিনি তোমাদের ওপর রহম করবেন। রহম শব্দটি রহমান থেকে এসেছে। যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবে আল্লাহ্‌তআলা তাকে নিজের সাথে মিলিয়ে নিবেন। আর যে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আল্লাহ্‌তাআলাও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। (তিরমিযী কিতাবুল বিররে ওয়াস্ সিলাহ্)

এক বর্ণনায় এসেছে তিনি (সঃ) বলেছেন, ঐ ব্যক্তির আমাদের সাথে কোন সম্পর্ক নেই যে, ছোটদের রহম করে না আর বড়দেরকে সম্মান প্রদর্শন করে না।"

আর এমন লোকদের যারা দুর্বল, গরীব, মিসকিনদের খেয়াল রাখে না, তাদের সতর্ক

করে তিনি (সঃ) বলেছেন, হারেসা বিন ওয়াহ্হাব থেকে বর্ণিত রসূল (সঃ) বলেছেন, জান্নাতবাসীদের সম্পর্কে কি আমি তোমাদের কিছু বলব, ঐ সকল দুর্বল যাদেরকে লোকেরা দুর্বল মনে করে, কিন্তু যখন সে আল্লাহ্তাআলার ওপর ভরসা করে তারই নামে কসম খায় তখন আল্লাহ্তাআলা তার কসমকে পূর্ণ করে দেন আর সে যেরূপ চায় তদ্রুপই করে দেন। এরপর বলেছেন, আমি কি তোমাদের দোযখবাসীদের সম্পর্কে বলব না? প্রত্যেক অবাধ্য, দাম্ভিক, আগুন মেজাজ অর্থাৎ তীক্ষ্ণ মেজাজ, অহংকারী দোযখের জ্বালানী হবে। এখন আমরা দেখবো আঁ হযরত (সঃ) এর প্রেমিক বন্ধু তাঁর (সঃ) পরিপূর্ণ নূর থেকে আলো অর্জন করে কিভাবে আমাদেরকে এদিক থেকে নসিহত করেছেন আর কি আমল করে দেখিয়েছেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেন যে, "যদি আল্লাহ্তাআলাকে খুজতে চাও তাহলে মিসকিনদের হৃদয়ে খোঁজ। এজন্যই পয়গাম্বরগণ মিসকিন এর জামা পরিধান করেছিলেন। এজন্যই বড় জাতির লোকদের ছোট জাতির লোকদের প্রতি হাসি তামাশা করা উচিত নয়। আর কেউ যেন না বলে যে আমার বংশ বড়। আল্লাহ্তাআলা বলেছেন, তোমরা যখন আমার কাছে আসবে তখন এই প্রশ্ন করব না যে তোমার জাতি কি? বরং এই প্রশ্ন করব তোমার আমল কি? এভাবেই পয়গাম্বরে খোদা (সঃ) বলেছেন, নিজের কন্যাকে, হে ফাতেমা! খোদাতাআলা জাত জিজ্ঞেস করবেন না। যদি তুমি কোন মন্দ কাজ কর তাহলে খোদাতাআলা এই কারণে ক্ষমা করবেন না যে তুমি রসূল (সঃ)-এর কন্যা। (মলফুযাত, তৃতীয় খন্ড, ৩৭০ পৃষ্ঠা)

এরপর তিনি বলেছেনঃ "তাকওয়ার অধিকারী হওয়ার জন্য শর্ত এটি যে নিজ জীবন গরীব এবং মিসকিনের ন্যায় যাপন করা এটি তাকওয়ার একটি শাখা যার মাধ্যমে আমাদেরকে নাজায়েয ক্রোধ এর মোকাবেলা করতে হবে। বড় বড় জ্ঞানী এবং সত্যবাদীদের জন্য শেষ ও কড়া পরীক্ষা এটি। নিজ পছন্দের ওপর দৃঢ়তা, ঔদ্ধত্য, গর্ব, অহংকার ক্রোধ থেকে সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ গর্ব, অহংকার ইত্যাদি সবই ক্রোধ থেকে সৃষ্টি হয় "আর এ ভাবেই কখনো ক্রোধ স্বয়ং নিজ পছন্দ ও গর্বের ফল হয়ে থাকে"। আর যদি হৃদয়ে অহংকার প্রভৃতি থাকে তাহলেও প্রত্যেকেরই রাগ হয় আর নিজে নিজেকে বড় ব্যক্তি মনে করে।' ছোটদের ওপর রাগ প্রকাশ করা শুরু করে দেয়। "কেননা ক্রোধ ঐ সময় হবে যখন মানুষ নিজেকে অন্যদের ওপর প্রাধান্য দেয়। আমি এটা চাই না যে আমার জামাতভুক্তরা পরস্পর একে অপরকে ছোট বা বড় মনে করে অথবা একে অন্যের ওপর গর্ব করে বা নিচু দৃষ্টিতে দেখে, কাউকে ছোট দৃষ্টিতে দেখে।" খোদা জানেন যে, কে বড় আর কে ছোট। এটি এক প্রকারের অবজ্ঞা যার মধ্যে ঘৃণা রয়েছে। ভয় আছে যে এই ঘৃণা বীজ এর ন্যায় বড় আর আর তাঁর ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়। কিছু ব্যক্তি আছে যারা বড় কোমলতার সাথে বড় আদবের সাথে আচরণ করে। কিন্তু বড় ঐ ব্যক্তি যে মিসকিনদের কথা মিসকিনের ন্যায় শুনে তাদের হৃদয় জয় করে, তাদের কথার প্রতি সম্মান করে, কোন কথা মুখে আনে না যাতে কষ্ট পেতে পারে। খোদাতাআলা বলেছেন ঃ (দেখুন সূরা হুজরাত ঃ১২)

তোমরা একে অপরের ব্যঙ্গ করে নাম নিওনা। এটি দৃস্কৃতিপরায়ণ ও গুনাগার এর কাজ। যে ব্যক্তি কাউকে উপহাস করে সে ততক্ষণ পর্যন্ত মরবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজে ঐ অবস্থায় পতিত হবে। নিজের ভাইদের তুচ্ছ মনে করো না। যখন সবই একই ঝর্ণা থেকে পানি পান কর তখন কে জানে যে কার ভাগ্যে অধিক পানি পান করার সৌভাগ্য হবে। দুনিয়াবী বিষয়াদী দ্বারা কেউ সম্মানিতও মর্যাদাবান হতে পারে না। খোদাতাআলার দৃষ্টিতে বড় সেই যে মুত্তাকী (সূরা হুজরাতঃ ১৪) (মলফুযাত ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২২-২৩)

আঁ হযরত (সঃ) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) দুর্বল এবং গরীবদের প্রতি খেয়াল রাখার যে দৃষ্টান্ত কায়েম করেছেন এখন আমরা তা দেখব একটি ঘটনার বর্ণনা আছে যে, হযরত (আঃ) মাগরিব নামাযের পর ছাদে বসে ছিলেন। কিছু লোক সাথে ছিল আর খাওয়ার জন্য লোক বসে ছিল তখন এক আহমদী মিয়া নিযামুদ্দীন (লুধিয়ানার অধিবাসী) তিনি খুব গরীব ছিলেন আর তাঁর কাপড়ও ছেড়া ও পুরানো ছিল, আর তিনি বড় খারাপ অবস্থায় ছিলেন। হুযূর (আঃ) থেকে চার পাঁচ লোক এর দূরত্বে বসে ছিলেন। বলা হয় যে ঐ সময়েই আরো কিছু লোক এসে গেল আর ঐ সকল লোক যারা পরবর্তীতে জামাত ছেড়ে গিয়েছিল তাদের মধ্য থেকে অধিকাংশ ছিল। হুযূরের (আঃ) নিকট বসে গেল যার কারণে মিয়া নিযামুদ্দীন পিছনে চলে গেলেন। এমনকি তিনি পিছনে জুতার স্থানে গিয়ে বসে পড়লেন। তখন খাবার এসে গেলে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) একটি তরকারীর বাটি নিলেন, কিছু রুটি নিলেন, আর মিয়া নিযামুদ্দীনকে বললেন, 'আস আমরা ভিতরে বসে খাবার খাই। আর মসজিদের সামনে যে ছোট কামড়া ছিল তাতে চলে গেলেন আর সেখানে বসে তার সাথে খাবার খেলেন। তখন হযরত মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব যিনি রেওয়ায়াত বর্ণনাকারী, তিনি বলেছেন, যে লোকেরা তাকে পিছনে হটাচ্ছিল তাদের চেহারার অবস্থা লজ্জার ফলে তাদের অবস্থা দেখার মত ছিল।"

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর খাদেমদের মধ্য থেকে একজন ছিলেন পীরা পাহাড়ীর দিন মজুর লোক। যিনি পাহাড়ী এলাকা থেকে এসেছিলেন। একেবারেই অজ্ঞ এবং নিরক্ষর লোক ছিলেন। অনেক ভুলভ্রান্তি করা সত্ত্বেও কখনো হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তাকে ধমক দেন নি। বর্ণিত আছে একবার হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পরেন। গরম কাল হওয়া সত্ত্বেও হাত পা একেবারে ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল। মসজিদের ছাদেই মাগরিব এর নামাযের পর

বসে ছিলেন। তখন যে সকল লোক বসে ছিল। তাদের চিন্তা হতে লাগল, তদবীর হওয়া আরম্ভ হল যে কি করতে হবে। ঐ পীরাও সে সংবাদ পেল, সে মাটির গর্তের কোন কাজ করছিল। কথিত আছে যে ঐ অবস্থাতেই সে ভেতরে এসে পড়ল আর দেখলও না যে কার্পেট ময়লা হচ্ছে কিনা আর ঐ কার্পেটে দাগ পড়তে থাকল। আর এসেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)এর পা টিপতে শুরু করে দিল। তখন লোকেরা তাকে ধমকানো শুরু করল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বললেন যে "এর কি কোন খবর আছে যা করছে তা করতে দাও, কোন অসুবিধা নেই। (সিরাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) মরতবা হযরত ইয়াকুব আলী সাহেব ইরফানী (রাঃ) পৃষ্ঠা ৩৫০)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর খাদেমদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত হাফেয হামেদ আলী সাহেব (রাঃ) মরহুম। তিনি দীর্ঘ সময় হুযূর (আঃ) এর খেদমত করেছেন। বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর (রাঃ) স্বভাবের মধ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর আখলাকের যে প্রভাব ছিল তা এত বেশি ছিল যে, বার বার তাঁর কথা উল্লেখ করতেন যে আমি কখনো এরূপ মানুষ দেখিনি বরং জীবন ভর হযরত সাহেবের পরও আখলাকের দিক থেকে ঐ মর্যাদার কোন লোক দৃষ্টিতে আসেনি। হযরত হাফেয সাহেব বলেছেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সারা জীবনে কখনো আমাকে ধমক দেন নি আর কঠিন ভাবে সম্বোধন করেন নি। বরং আমি খুবই অলস ছিলাম এবং অধিকাংশ সময়ই তাঁর (আঃ) হুকুম তামিল করতে দেরী করে ফেলতাম। এতদসত্ত্বেও সফরে তিনি আমাকে সঙ্গে রাখতেন। (সীরাতে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) মরতবা হযরত ইয়াকুব আলী সাহেব ইরফানী পৃষ্ঠা ৩৪৯-৩৫০)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর যতদিন পর্যন্ত এ অভ্যাস ছিল যে তিনি (আঃ) তাঁর বন্ধুদের সাথে বাইরে খাবার খেতেন, তিন কখনো এই পার্থক্য করেন নি, এই ভেদাভেদ করেননি যে কে তাঁর সাথে বসে আছে। কাউকে শুধু এই কারণে উঠানোকে নাজায়েয মনে করতেন যে তাঁর কাপড় চোপড় ছেড়া অথবা অশিক্ষিত কৃষক বা অন্য কোন জাতির লোক। তাঁর দস্তরখানে যে কেউ স্বাধীনভাবে যেখানে খুশি বসে যেত। 'খাকি শাহ' নামের গ্রামে বসবাসকারী এক লোক ছিল। বলা হয় যে, তার স্বভাব ছিল যে যখন খাবার আনা হত তখন সে লাফিয়ে লাফিয়ে লোকদের আগে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর নিকটে বসে যেতেন। যদি জায়গা কম হয়ে যেত তাহলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নিজেই এক পাশে সরে গিয়ে বসতেন আর তাকে বসার জায়গা করে দিতেন। বলা হয় যে সে দুনিয়াবী দিক থেকে এত সাধারণ ছিল যে, কেউই ঐ শ্রেণীর লোক আর ছিল না।

আজ প্রত্যেক আহমদীরও অন্যান্য মুসলমানদের জন্য বড়ই আবশ্যকীয় যে নিজের চারিপাশের, সমাজের মাঝে ঐ সকল দুর্বল এবং অসহায়দের অনুসন্ধান করে আর তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে যেন আঁ হযরত (সঃ) এর সাথে প্রেমের দাবীকে সত্য প্রমাণ করে দেখায়।

মাহর হামেদ কাদিয়ানের আরিয়দের মধ্য থেকে ছিলেন। যিনি তাঁর খানদানের মধ্যে প্রথম ছিলেন যিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর বয়াত এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। তিনি অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। এশিয়া, পাকিস্তানের এবং হিন্দুস্তানের লোকেরা যারা এখানে বসে আছেন তারা জানেন যেখানে ডেরা সেখানে মহিষ বাধা থাকে। সেখানেই ঘর হয় আর সেখানেই সবকিছু হয় তাদেরই ময়লা আবর্জনা হয়। ঐ ব্যক্তি যখন অসুস্থ হলেন তখন হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তাকে দেখতে যেতেন। আর সেখানে একদিকে গোবর আর ময়লা আবর্জনা প্রভৃতি স্তুপ হয়ে থাকত। তার খুব দুর্গন্ধও হত। হযরত (আঃ) স্বভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা প্রিয় ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কখনো ইশারা করেও এটা প্রকাশ করেন নি যে দুর্গন্ধ আসছে। বরং নিয়মিত তার দেখা শুনার জন্য স্বয়ং যেতেন আর তার সাথে খুব মহব্বত আর আনন্দদায়ক কথাবার্তা বলতেন। আর অনেকক্ষণ পর্যন্ত অসুখ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। অতঃপর ঔষধ বলে দিতেন দোয়ার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। সে এক সাধারণ কৃষক ছিল বরং বলা হয় যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর খানদান এর যে জমিদারী ছিল সেখানে সেই তুলনায় সে তার (আঃ) প্রজাদের মধ্যে শামিল ছিলেন। কিন্তু কখনো তিনি (আঃ) গর্ব করেন নি। তিনি (আঃ) যার নিকটই যেতেন তাকে নিজের সম্মানীত ভাই মনে করতেন।

নিজ মালিকের পদাঙ্ক অনুসরণে এই ছিল হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর দৃষ্টান্ত। আঁ হযরত (সঃ) দুর্বল শ্রেণীদের প্রতি সহানুভূতির যে দৃষ্টান্ত কায়েম করেছেন আর আজ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর ওপর চলে দেখিয়েছেন। এই নমুনা কোন দিন পুরনো হওয়ার নয়। বরং আজও যদি আল্লাহ্তাআলার ফযল কামনা করতে হয় আর তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হয় আর আঁ হযরত (সঃ) এর প্রেমিক হওয়ার দাবীকে সত্যি প্রমাণিত করে দেখানোর হয় তাহলে এ সকল নমুনার ওপর চলতে হবে।

আজ প্রত্যেক আহমদীরও অন্যান্য মুসলমানদের জন্য বড়ই আবশ্যকীয় যে নিজের চারিপাশের, সমাজের মাঝে ঐ সকল দুর্বল এবং অসহায়দের অনুসন্ধান করে আর তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে যেন আঁ হযরত (সঃ) এর সাথে প্রেমের দাবীকে সত্য প্রমাণ করে দেখায়। আল্লাহ্তাআলা সেই তৌফীক দান করুন। আমীন

(আলফযল লন্ডন ; ৩১ ডিসেম্বর ২০০৪ইং)

অনুবাদ ঃ জহির উদ্দীন আহমদ ও শরীফ আহমদ

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর চিঠি-পত্র

(মকতুবাতে আহ্মদীয়া, ৫ম খন্ড)

সংকলক– হযরত ইয়াকুব আলী ইরফানী (রাঃ)

(ষষ্ঠ কিস্তি)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) এর নামে

পত্র নং ৩৬-এর অবশিষ্টাংশ

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম
নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

শিক্ষিতা স্ত্রী না বুদ্ধিমতি ঃ

স্ত্রী শিক্ষিতা হতে হবে, এদিকে আমার বেশি খেয়াল নেই। বরং আমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো, পুরুষ হোক বা স্ত্রীলোক, সে যদি স্বচ্ছ ও পবিত্র মন-মানসিকতা এবং প্রকৃতি ও স্বভাবের দিক থেকে উত্তম যোগ্যতা ও প্রতিভার অধিকারী হয় তাহলে 'উম্মীয়াত'(–নিরক্ষরতা) তার জন্যে কোন বড় ধরণের প্রতিবন্ধকতা নয়। সে শীঘ্রই সহচার্যের মাধ্যমে ধর্মীয় ও জাগতিক আবশ্যকীয় বিষয়াদি সম্বন্ধে অবহিত হতে পারে। জরুরী বিষয় হচ্ছে, স্ত্রী যেন বুদ্ধিমতি হয় এবং তার বাহ্যিক সৌন্দর্যও থাকে, যাতে তার সাথে মিল-মহব্বতের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যায়। আপনি এ বিবেচনাধীন জায়গাটিতে উক্ত শর্তটির ব্যাপারে ভালভাবে অনুসন্ধান করে নিন। যদি মনোপূত সাব্যস্ত হয় তাহলে আলহামদুলিল্লাহ্। নচেৎ অন্যান্য জায়গায় পুরোপুরি প্রচেষ্টার মাধ্যমে পাত্রী সন্ধানের কাজ শুরু করা যাবে। বান্দার কাজ কেবল চেষ্টা করা এবং কাঙ্ক্ষিত বিষয় সহজলভ্য করা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কাজ। তবে অবশ্যই এই উপায়-উপকরণের জগতে চেষ্টা-প্রয়াসে সুফল লাভ হয়ে থাকে। আমি এখনও কোন বন্ধুর কাছে এ খোঁজ-খবর নেয়ার বিষয় লিখি নাই। কেননা এখনও আপনার পক্ষ থেকে সুনিশ্চিত ও সুনির্দিষ্ট মতামত আমি পাই নি। তাই আমার ওপর দায়িত্ব বর্তায়, মধ্যবর্তী ধ্যান-ধারণাগুলোর শীঘ্র নিষ্পত্তি করার পর যদি নতুন জায়গায় (পাত্রী) তালাশের প্রয়োজন হয়ে পড়ে তাহলে আমাকে তা অবহিত করুন। আর পূর্বেও যেমন আমি লিখেছিলাম, আপনি আপনার খরচাদির ব্যাপারে সতর্ক হোন। কেননা এসব অর্থই জীবিকা নির্বাহের মৌল উপায়-উপাদান বিশেষ এবং নিজ প্রয়োজনের সময়ও মহা সওয়াব অর্জনের কারণ হয়ে যায়। এবং আপনি যেমন ওয়াদাবদ্ধ হয়েছেন (সে অনুযায়ী) কোন অবস্থায়ও (নিজে উপার্জিত অর্থের) এক তৃতীয়াংশের বেশি খরচ করবেন না।

নবীগণের দু'টি অস্ত্র ঃ

ইংরেজি শিক্ষিতদের সম্পর্কে যা আপনি লিখেছেন, এটা এক অতি উত্তম পরামর্শ। আল্লাহ্‌তাআলা আপনার এই উঁচু ও উন্নত মানের নিয়ত তথা ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে কল্যাণমন্ডিত করুন। নবীদের কাছে দু'টি অস্ত্র ছিল, যা দিয়ে তাঁরা বিজয়ী হয়েছেন। এক, দৃশ্যত সচেতন বক্তব্য, যা প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদীকে অভিযুক্ত ও নিরুত্তর করে দিত। দ্বিতীয়ত আধ্যাত্মিক (বাতেনী) মনোনিবেশ, যা মানব-হৃদয়ে জ্যোতির্ময় (নূরানী) প্রভাব ফেলে। শুরুতে নবীদের উপদেশ-বাণীর যে স্বল্পমাত্রায় প্রতিফলন ঘটেছে, বরং নানা ধরনের দুঃখ-কষ্ট তাঁদের পোহাতে হয়েছে এবং নানা ধরণের হীন অপবাদ তাঁদের সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হয়, এর কারণ হলো, তাঁদের উদ্যম ও সংকল্প (প্রথম) সচেতন বাণীর প্রচার ও বিস্তারে এবং বিরুদ্ধবাদীদের নিরুত্তর করণে নিয়োজিত থাকে আর এতে যখন কোন যথাযথ ফায়দা প্রতিফলিত হয় নি এবং মনঃভঙ্গের করণ হয়, তখন (কবি) হযরতে মাহ্‌দীর উক্তি –"বা হিম্মত নুমায়েন্দ্ মার্দি রিজাল"–অনুসারে আধ্যাত্মিক দৃঢ় সংকল্প ও মনঃসংযোগকে কাজে লাগানো হয়।

আধ্যাত্মিক উদ্যোগের কৃতিত্ব ঃ

এই আধ্যাত্মিক উদ্যম ও মনঃসংযোগ সুতীক্ষ্ণ তরবারীর চেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে। আমার দৃষ্টিতে নবীদের সফলতার মোক্ষম কারণ ছিল এই আধ্যাত্মিক উদ্যম ও মনঃসংযোগ। আর এও স্মর্তব্য যে, ফলাফলের সিদ্ধান্ত শেষ পরিণামের ওপর নির্ণিত হয়ে থাকে। খোদাতাআলা এ কথাই বলেছেন ঃ "আল-আকেবাতু লিলমুত্তাকীন" (–পরিণামে সফলতা মুত্তাকীদের জন্য অবধারিত–অনুবাদক)

আল্লাহ্‌তাআলার সুন্নত (চিরায়ত নিয়ম) এভাবেই জারি হয়েছে যে, সত্যবাদী ব্যক্তিরা তাঁদের পরিণাম দিয়ে পরিচিত হয়ে থাকেন। এ অধম ভালভাবে জানে, আমি যে কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছি, তা মানুষের কাছে এখনও অতি সন্দেহজনক। এবং একথা বলায় অত্যুক্তি হবে না, এখনও ফায়দার পরিবর্তে ক্ষতির অবস্থাই পরিলক্ষিত অর্থাৎ হেদায়াতের পরিবর্তে বিপথগামিতা ও কুধারণা পোষণ তাদের কাছে সহজ বলে মনে হয়। কিন্তু আমি যখন একদিকে কুরআনের আয়াতসমূহ পাঠ করি কেননা শুরুতে নবীদের ওপর এমন সব কঠিন ভূমিকম্পসম বিপদাবলী আসে যে দীর্ঘ কাল যাবৎ সফলতার কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না কিন্তু পরিশেষে ঐশী সাহায্য-সহায়তার সমীরণ বইতে শুরু করে। আর অন্যদিকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর পরম সত্য প্রতিশ্রুতি সমূহের মাধ্যমে অযস্র সুসংবাদ পাই। এতে আমার দুঃখ-বেদনা সম্পূর্ণ দূর হয়ে যায় এবং এ বিষয়ে সজীব ও তরতাজা ঈমান উদ্দীপ্ত হয় ঃ "কাতাবাল্লাহু লা-আগ্‌লিবান্না আনা ওয়া রুসুলী" (–আল্লাহ্ লিখে দিয়েছেন, 'আমি এবং আমার রসূলগণ অবশ্যই জয়যুক্ত হব'–অনুবাদক)

বর্তমান যুগের অস্ত্র (প্রতিষেধক ও প্রতিকার) ব্যবস্থা কী?

আমার দৃঢ়বিশ্বাস, বর্তমান যুগের পচা-গলা হাড়গোড় ও দূষিত পদার্থের মূলোচ্ছেদ কেবল নিরস ও বাহ্যিক যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে সম্ভব নয়। আঁধার সর্বদা নূরের মাধ্যমে দূর হয়েছে। এবং এখনও ঈমানী জ্যোতি এই অন্ধকারকে দূর করবে। এরূপ সংগ্রামক্ষেত্রে সে সব লোক কাজ করতে পারে না যারা বক্তৃতা বা ভাষণ দিতে অত্যন্ত তুখড় কিন্তু ঈমানী বিশ্বস্ততা ও সত্যতার (ঐশী) আলোড়ন-উদ্দীপনে উজ্জীবিত হয় নি।

ইংরেজী শিক্ষিত কিরূপ ব্যক্তিরা কাজে আসতে পারেন?

তবে 'ফযল ও ইহ্সান-ইলাহী'তে তথা ঐশী কৃপায় ও অনুগ্রহে যদি কোন ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তির মাঝে উক্ত বিষয় দু'টো সন্নিবেশিত হয় তাহলে অবশ্য 'নূরুন আলা নূর' তথা সোনায় সোহাগা হবে। আর এরকম ইংরেজী শিক্ষিত লোক যদি আমাদের সহজলভ্য নাও হয়, তবু আমরা কখনই নিরাশ নই। আর কেনই বা নিরাশ হবো? আমাদের কাছে 'আস্দাকুস্ সাদেকীন' তথা সবচেয়ে সত্যবাদী আল্লাহ্তাআলার পরম সত্য প্রতিশ্রুতিসমূহের এক ভান্ডার রয়েছে এবং আমাদের স্বস্তি ও আত্মসন্তুষ্টির জন্য কুরআন করীমের এ সব আয়াত যথেষ্ট, যা আমরা পড়ে থাকি ঃ "আম্ হাসিব্তুম আন তাদ্খুলুল জান্নাতা ওয়া লাম্মা ইয়া'তিকুম মাসালুল্লাযিনা খালাও মিন কাবলিকুম মাস্সাত্হুমুল বা'সাউ ওয়ায্ যার্রাউ ওয়া যুল্ যিল্ হাত্তা ইয়াকূলার রাসূলু ওয়াল্লাযীনা আমানু মায়হু মাতা নাস্-রুল্লাহি আলা ইন্না নাস্ রাল্লাহি ক্বারীব" (-তোমাদের কি ধারণা, তোমাদের পূর্বে যারা অতীত হয়েছে তাদের ন্যায় অবস্থা তোমাদের ওপর আসার আগেই তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক দুঃখ-কষ্ট তাদেরকে জর্জরিত করেছিল এবং তাদেরকে এত ভীত ও কম্পিত করা হয়েছিল যে পরিশেষে রসূল ও তার সাথে মু'মিনরা বলে উঠেছিল, 'কখন আল্লাহ্র সাহায্য আসবে?' স্মরণ রেখো আল্লাহ্র সাহায্য নিকটেই।'-অনুবাদক)। এখন আমাদের ইনসাফ করা উচিত, এ যাবৎ আমরা কী-বা দুঃখ-কষ্ট সয়েছি? এবং কী কী প্রকম্পিত করা বিপদ আমাদের ওপর এসেছে? কতটুকু ধৈর্য ধরে সময় অতিবাহিত হয়েছে? এটা তো চরম বেয়াদবি, আমরা যদি প্রথম দিন তথা সূচনা থেকেই আমাদের মহা মহীম কৃপালু খোদাতাআলার সম্বন্ধে আক্ষেপ করি যে, তিনি আমাদের পরিশ্রমের কোনো সুফল দেন নি। আমাদের উচিত অটল-অবিচল থাকা। নিঃসন্দেহে কল্যাণজনক সুফল প্রকাশিত হবে। "লা তাব্দীলা লি-কালিমাতিল্লাহ্" (-আল্লাহ্র কথায় কখনই কোন ব্যত্যয় ঘটবে না-অনুবাদক)।

সে ছেলেটির অবস্থা আপনি খুব ভালই স্মরণ করিয়েছেন। আমি তো একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। স্মরণ-শক্তির ত্রুটি এবং সবদিকে কাজের ভীড়। ইনশাআল্লাহ্ এখন এ ধ্যানে লাগবো। আর এর জন্য যদি সময় পাওয়া যায় তাহলে (দোয়ায়) মনোনিবেশ করবো, শীঘ্র হোক, কিম্বা বিলম্বে। কেননা 'ইখ্ তিয়ারী' বিষয় নয়। "ওয়ামা নাতানাযযালু ইল্লা বি-আমরি রাব্বিকা" ('ফিরিশ্তারা বলবে,) আমরা তোমার প্রভু-প্রতিপালকের আদেশ ছাড়া অবতরণ করি না' [সূরা মারইয়াম ঃ ৬৬ -অনুবাদক]।

ওয়াসসলাম

বিনীত গোলাম আহমদ কাদিয়ান,]

২৯ ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৮ইং

পত্র নং ৩৭

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

শ্রদ্ধেয়, সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার পত্র পেলাম। এটি হুবহু মীর সাহেবের খিদমতে পাঠানো হয়েছে।

বিয়ে-শাদিতে কী ধরণের সাবধানতা আবশ্যকঃ

প্রথম থেকে আমিও তেমনটিই লিখেছিলাম যেমনটি (এখন) আপনি লিখেছেন। কিন্তু আমি পুনরায় লিখা সমীচীন মনে করি, আপনি অবশ্যই একজন বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী মেয়েলোক পাঠিয়ে সম্পূর্ণ অবস্থা সরাসরি জেনে নিন। কেননা এটা সারা জীবনের ব্যাপার। এতে যদি অন্তরালে থাকা কোন খারাপি বেরিয়ে আসে তাহলে সেটি তখন অপ্রতিকার যোগ্য হয়ে থাকে। মীর আব্বাস আলী শাহ্ সাহেব যদিও অতি নিষ্ঠাবান ও সত্যপরায়ণ লোক, কিন্তু মীর সাহেবের স্বভাবে অত্যন্ত সরলতা রয়েছে। আমার মতে চেহারা ও বাহ্যিক অবয়ব ইত্যাদি বিষয়ে আপনার পক্ষে সন্তোষজনকভাবে অবগত হওয়া খুবই সমীচীন এবং জরুরী। এক্ষেত্রে শৈথিল্য করবেন না। কেননা বিষয়টি নাজুক। স্ত্রী যদি মনমত পছন্দীয় হয়, তাহলে সে নিঃসন্দেহে ইহকালেই এক বেহেশ্ত তুল্য এবং তাকওয়ার জন্য সম্পূর্ণ সহায়ক। খোদা করুন, যদি বাহ্যিক চেহারায় ও অবয়বে বিশ্রী ও অরুচিকর দাঁড়ায় তাহলে সে এ দুনিয়াতেই এক দোযখস্বরূপ। কাজেই (পাত্রীকে দেখার উদ্দেশ্যে) কোন একজন বুদ্ধিমতী, নির্ভরযোগ্যা বিশ্বস্ত মহিলাকে আপনার পক্ষ থেকে পাঠানো সমীচীন হবে। এতে সব অবস্থা তথ্য ও গুণাগুণ সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে। এক্ষেত্রে কখনই আলস্য বা অবহেলা করবেন না। বিয়ে করার ক্ষেত্রে (এর প্রক্রিয়ায়) যে ভুল-ত্রুটি ঘটে যায় এর মত মর্মান্তিক ভুল আর অন্যটি নেই। এর পর আপনিই ভাল বুঝেন। আর হিন্দু ছেলেটির জন্য ইনশানআল্লাহ্ এ বিষয়ের নিষ্পত্তির পর (দোয়ায়) মনোনিবেশ করবো।

বিনীত

গোলাম আহমদ, (কাদিয়ান)

নোট ঃ এ পত্রটিতে কোন তারিখ লেখা নেই। কিন্তু এর বিষয়বস্তু থেকে প্রতীয়মান হয়, এ পত্রটি হয়তো ১৮৮৮ইং সালের জানুয়ারীর শেষ দিকের, অথবা ফেব্রুয়ারীর প্রথম দিকের। কেননা এ পত্রটি ১৩ জানুয়ারী ১৮৮৮ইং তারিখের চিঠির উত্তরে লিখা চিঠির পরবর্তী সময়ে বলে প্রতীয়মান হয়। (ইরফানী)

পত্র নং ৩৮

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হেকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহুতাআলা)

এ পত্রটি লেখার উদ্দেশ্য আপনাকে একটা কষ্ট দেয়া। আর তা হলো, আমার চাচাতো ভাই মির্যা ইমামুদ্দীন সাহেবের কাছে একটি অতি দামী ঘোড়া রয়েছে, যা বেশ দ্রুতগামী এবং রাজা ও রঈসদের আরোহণযোগ্য। এখন তিনি এটা বিক্রি করতে চান। যেহেতু এতো উচ্চ মূল্যের ঘোড়া সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার উর্ধ্বে এবং রঈসগণ এধরণের জিনিসের সন্ধানে থাকেন। কাজেই আপনাকে এ কষ্ট দিতে বাধ্য হচ্ছি, অনুগ্রহপূর্বক আপনি জম্মুর রঈস অথবা তাঁর কোন ভাইয়ের কাছে (এ ব্যাপারে) আলোচনার মাধ্যমে চেষ্টা করুন,যাতে তিনি ঘোড়াটি সমোচিত দামে কিনেন এবং তার পক্ষে কেনার ইচ্ছা পাকাপোক্ত হলে ঘোড়াটি আপনার খিদমতে পাঠানো যায়। আবশ্যকীয়ভাবে কার্যকরী প্রচেষ্টা গ্রহণের পর এ বিষয়ে অবগত করে কৃতার্থ করুন। ওয়াস্সালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ

কাদিয়ান, ৩ মার্চ১৮৮৮ইং

মন্তব্য ঃ মির্যা ইমামুদ্দীন ছিলেন ঘোর শত্রু ও বিরুদ্ধবাদী। তা সত্ত্বেও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তার জন্যে সুপারিশ করতে দ্বিধা করেন নি। এটা 'মাওয়াদ্দাতান ফিল কুর্বা' অর্থাৎ নিকটাত্মীয়দের ক্ষেত্রে ভালবাসাপূর্ণ সদাচরণের একটি জ্বলন্ত প্রমাণ এবং শত্রুর প্রতি দয়া-মায়া ও মহানুভবতা প্রদর্শনের একটি প্রকাশ্য নমুনা ও দৃষ্টান্ত। (ইরফানী)

পত্র নং ৩৯

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা!

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার পত্র পেলাম। এর সাথে আবশ্যকীয় কিছু কথা লিখে এটি হুবহু মীর সাহেবের খিদমতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সাহেবযাদা ইফতিখার আহমদ সাহেব-যাঁর ভাগ্নির সাথে বিয়ের এই প্রস্তাব, তিনি একজন অতি সম্ভ্রান্ত ও হৃদয়বান ব্যক্তি। ব্যক্তিগতভাবে আপনার সাথে তাঁর কোন মনোমালিন্য নেই। কেবল আজকালের হাঙ্গামা ও শোরগোলের প্রেক্ষিতে তিনি লিখেছিলেন। আশা করি, হেকীম ফযল দ্বীনের পৌছার পর নির্দ্বিধায় কথা পাকা-পাকি হয়ে যাবে। এখানে সার্বিকভাবে মঙ্গল রয়েছে। 'সিরাজ মুনীর' ও 'আশি'য়াতুল কুরআন' পুস্তক দু'টির পরিসমাপ্তির পথে কিছু বিধা-বিপত্তি ছিল। এখন আল্লাহ্‌তাআলার অনুগ্রহে সেগুলো সবই সমাধান হয়ে গেছে এবং আশা করা যায়, মুবারক মাহে রমযানে এ কাজ শুরু হয়ে যাবে। বই দু'টোর বাহ্যিক বিন্যাসের কাজ কিছুটা বাকী আছে। এ কেবল দশ-পনের দিনের কাজ। স্বাস্থ্য ও সুযোগ-সময় নির্বিঘ্ন থাকলে ১লা রমযান তারিখে ছাপার কাজ আল্লাহ্‌র ফযলে শুরু হয়ে যাবে। আর বাকী সব দিক দিয়ে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে মঙ্গল রয়েছে। বশীর আহমদ (শিশু-পুত্র) ভাল আছে।

ওয়াসসালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ

কাদিয়ান, ১৬ এপ্রিল ১৮৮৮ইং

পত্র নং ৪০

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

শ্রদ্ধাভাজন হযরত মৌলবী সাহেব (সল্লামাহুতাআলা)

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

বাটালায় জনাবের পত্রটি পেয়েছি। আল্লাহ্‌জাল্লাশানুহু আপনাকে সালামত (নিরাপদ) রাখুন এবং সুস্থ ও মঙ্গলমত ফিরিয়ে আনুন। আপনার দিকে আমার খেয়াল বিশেষভাবে নিবদ্ধ থাকে। মিঞা মোহাম্মদ উমরের ব্যাপারে অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় রয়েছি। খোদাতাআলা সর্বোত্তম উপায়ে এই অপ্রীতিকর বিষয়টি রফা-দফা করুন। বশীর আহমদ এখন কিছুটা আরোগ্যের দিকে। কিন্তু রমযানের শেষ অব্দি বাটালাতেই অবস্থান করার ইচ্ছা রাখি। কেননা ওষুধ ইত্যাদি এখানেই সহজলভ্য। এবং কিছুটা ডাক্তারের চিকিৎসাও শুরু হয়েছে। হেকীম ফযল দ্বীন সাহেব লুধিয়ানা উপলক্ষে কবে যাবেন তা জানা নেই। কাজেই আপনার এখন রমযানের পর আসাটাই সমীচীন। আপনি অনুগ্রহপূর্বক নিজ অবস্থা ও কুশলাদি সম্পর্কে শীঘ্র শীঘ্র অবগত করতে থাকবেন। এ অধম বাটালায় নবী বখ্‌শ যয়লদারের বাড়ীতে অবস্থানরত আছে। ওয়াস্‌সালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ

বাটালা, ২৮মে ১৮৮৮ইং

পত্র নং ৪১

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা!

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

জনাবের স্বভাবে যদিও বিনয় ও শিষ্টতা পরিপূর্ণভাবে রয়েছে, আর এটাই 'উবুদিয়াতের (তথা ঐশী দাসত্ত্বের) প্রধান শর্ত। কিন্তু "ওয়া আম্মা বিনি'মাতি রাব্বিকা ফা-হাদ্দিস্" [এবং তোমার প্রভু প্রতিপালকের যে কল্যাণ ও অনুগ্রহ (তোমার প্রতি) রয়েছে তা (অন্যদের কাছে) বর্ণনা কর'-অনুবাদক] এ আয়াতের আদেশ অনুযায়ী ঐশী অনুগ্রহরাজীকে প্রকাশিত করাও একান্ত আবশ্যক। আল্লাহ্‌তাআলা আপনাকে 'এলমে দ্বীন' (ধর্ম-জ্ঞান), আক্‌লে সালীম' (সরল-সঠিক বিবেক-বুদ্ধি) দান করেছেন এবং একটি বিশেষ নেয়ামত 'ইনশিরাহে সদর' (হৃদয়ের প্রশস্ততা)-ও দান করেছেন। আরও দান করেছেন নিজের দিকে মনোনিবেশ। এ সমূদয় নেয়ামত শোকর ও সমাদর করার যোগ্য। আপনার পত্র পেয়েছি। জানি না, কবে নাগাদ আপনি জম্মু ফিরে আসবেন। আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু আপনাকে মঙ্গলমত ও সুস্থতার সাথে নিজ রহমতের ছায়ায় আশ্রিত রাখুন এবং সফর ও আবাসে সব অবস্থায় তাঁর অনুগ্রহ ও ইহ্‌সান আপনার সহজাত ও সহায়ক হোক। এখানে সর্বোতভাবে কুশল রয়েছে। ওয়াসসালাম

বিনীত

গোলাম আহমদ

(উফিয়া আনহু) ২২জুন, ১৮৮৮ইং

নোট ঃ ৪১ থেকে ৪৫ নং পত্র পাঁচটি ৮৭ নং পত্রের পর সন্নিবেশিত হবে। (ইরফানী)

পত্র নং ৪৬

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হেকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহুতাআলা)

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

গত কালের ডাকে আপনার পত্র পেলাম। 'তাকমীলে তবলীগ' ইশ্‌তেহারে (বয়আত গ্রহণের) দিন-তারিখের কথা যা লেখা হয়েছে তা কেবল এক ব্যবস্থামূলক বিষয় মাত্র। যাতে এ রকম অনুষ্ঠান উপলক্ষে আগত কিছু সংখ্যক মু'মিন ভ্রাতা দেখা-সাক্ষাতে পরস্পর পরিচয় লাভ করতে পারেন, যা আবশ্যকীয়ভাবে কোন জরুরী বিষয় নয়। আপনার যখন অবসর হয় এবং কোন রকম প্রতিবন্ধকতা না থাকে তখন এই আনুষ্ঠানিকতাকে পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে আপনার জন্য আসার অনুমতি রয়েছে। বিয়ে উপলক্ষে আপনি যখন আসবেন, সেটি বরং অতি উত্তম মওকা। আর বায়আতের শর্তাবলীতে বদ্ধপরিকর হবার বিষয়টি হলো সামর্থ্যের অনুপাতে। "লা ইউকাল্লিফুল্লাহু নাফসান ইল্লা উস্‌য়াহা"(-আল্লাহ্ কারও ওপর তার সামর্থ্যের উর্ধ্বে বোঝা চাপান না-অনুবাদক)। দ্বিতীয় পত্রটির উত্তর শীঘ্র অবহিত করুন, যাতে লুধিয়ানায় সংবাদ দেয়া যায়। বাহ্যত মনে হয়, আপনি সম্ভবত মার্চ মাসে কাশ্মীরের দিকে রওয়ানা হতে পারবেন। অতএব পরিস্থিতি যদি এটাই দাঁড়ায় তাহলে বিয়ের শুভ কাজটি ফেব্রুয়ারী মাসে সুসম্পন্ন হয়ে যাওয়া উচিত।

লাহোর থেকে মুন্সী আব্দুল হক সাহেব ও বাবু এলাহী বখ্‌শ সাহেব এসেছিলেন। মুনশী আব্দুল হক সাহেব এ মর্মে বক্তব্য রেখেছিলেন যে, (লেখরামের পুস্তকের উত্তরে আপনার প্রণিত) 'রদ্দে তকযীব' সর্বসাধারণের কাছে পছন্দীয় করে তোলার উদ্দেশ্যে আবশ্যকীয়ভাবে পুস্তিকাটির ভূমিকায় যেন একথা স্পষ্ট করে লেখা হয় যে, হুবহু আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিশ্বাস মোতাবেক খোদাতাআলার অসীম কুদরত ও ক্ষমতার ওপর আমাদের সুদৃঢ় ও সার্বিক বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও (যুক্তি- তর্কের ক্ষেত্রে) কোন কোন বিরল ধরণের উত্তর কেবল বিরুদ্ধবাদীদের সংকীর্ণতা ও জ্ঞানাভাবের প্রেক্ষিতে তাদের রুচী মাফিক লিখা হয়েছে, যাতে তারা জানতে পারে, কুরআন করীমের বিরুদ্ধে শাস্ত্রগত কিম্বা যুক্তিগত কোন দিক দিয়েই কারও পক্ষে আপত্তি উত্থাপনের মোটেও কোন সুযোগ নেই। এ অধমের মতে (ভূমিকায়) এরূপ লেখা একান্তই জরুরী, যাতে জনসাধারণ (সম্ভাব্য) এ ফেৎনা (ও সশংয়) থেকে রক্ষা পায়। আর সবদিক দিয়ে কুশল রয়েছে। ওয়াসসালাম। (চলবে)

বিনীত

গোলাম আহমদ

কাদিয়ান, ২০ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৯ইং

অনুবাদ - মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

মুরব্বী সিলসিলা

আহমদীয়ত

মূল ঃ কাযী মোহাম্মদ নাযির সাহেব ফাযেল
নাযের তসনীফ ও ইশাআত লিটারেচার, রাবওয়া

(সপ্তম কিস্তি)

মসীলে মসীহ্ -এর দাবী 'ফতহে ইসলাম' পুস্তকের আগে করেছিলেন

আবার এ কথার প্রমাণ যে, মসীলে মসীহ্ (মসীহ্ সদৃশ)-এর দাবী 'ফতহে ইসলাম' পুস্তকেই করা হয় নি বরং এর দাবী আগেও মজুদ ছিল। 'ইযালাহ্ আওহাম' পুস্তকে হুযূর (আঃ) লিখেনঃ

"আমি কখনও এ দাবী করি নি যে, আমি মসীহ্ ইবনে মরিয়ম। যে-ব্যক্তি আমার ওপর এ অভিযোগ লাগিয়ে দেয় সে সর্বৈব মিথ্যারোপকারী ও মিথ্যাবাদী। বরং সাত-আট বছর ধরে আমার পক্ষ থেকে সব সময় এটাই প্রচার করা হয়েছে যে, আমি মসীলে মসীহ্"(ইযালাহ্ আওহাম, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯০)।

এথেকে প্রকাশিত হয়, ১৮৯১ থেকে অর্থাৎ 'ইযালাহ্ আওহাম' পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার সাত-আট বছর আগ থেকে তাঁর মসীলে মসীহ্র দাবী মজুদ ছিল এমনকি বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকেও এ দাবী মজুদ আছে। এটা ১৮৮৪ সনের পুস্তক। এতে তিনি (আঃ) লেখেন ঃ

"এ অধমের স্বভাব-চরিত্র ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর স্বভাব-চরিত্র পরস্পর খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ দেখা যায় যদিও একই মণির দুটো টুকরো বা একই গাছের দু'টি ফল। আর অশেষ সাদৃশ্য যে, দিব্য-দৃষ্টিতে খুবই সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে..... সুতরাং যেহেতু মসীহ্ (আঃ)-এর সাথে এ অধমের পুরোপুরি সাদৃশ্য রয়েছে তাই খোদাওন্দ করীম মসীহ্-এর ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রাথমিক কাল থেকেই এ অধমকেও অংশীদার করে রেখেছেন" (বারাহীনে আহমদীয়া, ৪ খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৯৯)।

এ উদ্ধৃতি থেকে প্রকাশিত, 'ইযালাহ্ আওহাম'-এ তাঁর এটা লেখা একেবারে সঠিক। কেননা, ১৮৯১ সনেরও ৭-৮ মাস আগ থেকে তাঁর (আঃ) মসীলে মসীহ্-এর দাবী মজুদ ছিল। এ উদ্ধৃতি থেকে এটাও তো প্রকাশিত হয়ে যায় যে, তিনি (আঃ) মসীহ্-এর আবির্ভাব সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে অংশীদার হওয়ার দাবীদার ছিলেন। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও তিনি (আঃ) মসীহে মাওউদ দাবী করেন নি। কেননা, প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি (আঃ) নিজেও হযরত ঈসা আলায়হে সালামের জীবিত থাকা এবং তাঁর দ্বিতীয়বার সশরীরে আগমন করায় বিশ্বাসী ছিলেন।

মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর দাবী ইসলামের ভিত্তিতে নাকি পরামর্শের ভিত্তিতে

১৯৯০-৯১ সনে তাঁর মসীহ্ হওয়ার দাবীর সাথে যা আগে থেকেই মজুদ ছিল, তাঁর প্রতি কাশ্ফ হয় ঃ

"মসীহ্ বিন মরিয়ম রসূলুল্লাহ্ মারা গেছেন আর তাঁরই রঙ্গে রঙ্গীন হয়ে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তুমি এসেছ। ওয়া কানা ওয়াদুল্লাহি মাফ'উলা (আর আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সফল হয়েই থাকে)" (ইযালাহ্ আওহাম,পৃষ্ঠা ৫৬১)।

তদুপরি তাঁর প্রতি এ ইলহামও অবতীর্ণ হয় ঃ "জাআলনাকাল মসীহুবনু মারইয়ামা "অর্থাৎ তোমাকে মসীহ্ ইবনে মরিয়ম করে পাঠানো হয়েছে (ইযালাহ্ আওহাম, পৃষ্ঠা ৬৩৬)।

তখন তিনি (আঃ) বুঝতে পারলেন, মসীহ্ বিন মরিয়মের সশরীরে আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী পুরো হওয়ার ছিল না। কেননা, খোদাতাআলা তাঁকে (আঃ) রূপকভাবে এখন মসীহ্ বিন মরিয়মও নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং প্রকৃত মসীহ বিন মরিয়মের মৃত্যুর সংবাদও দিয়েছেন আর মসীহের দ্বিতীয়বার আগমনের প্রতিশ্রুতি খোদার দৃষ্টিতে তাঁর (আঃ) সাথেই সংশ্লিষ্ট ছিল। আশ্চর্যের কথা, মৌলভী আবুল হাসান নদভী সাহেব মসীলে মসীহ্-এর দাবীকে ১৮৯১সনে নির্ধারণ করে দিচ্ছেন। যদিও আমরা বলে এসেছি, এ দাবী বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকে ১৮৮৪ সন থেকে মজুদ ছিল। অতএব সত্য কথা এই, ১৮৯১ সনে মসীলে মসীহ্-এর দাবীকে আহমদী জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা পরিত্যাগ করেন নি বরং নতুন ইলহামগুলোর আলোকে নিজেকে নিজে মসীলে মসীহ্ জেনেই মসীহে মাওউদ নির্ধারণ করে দিয়েছেন আর হযরত ঈসা (আঃ)-এর সশরীরে দ্বিতীয়বার আগমনের ধারণা ঐশী ইলহামের আলোকে এসব ইলহামকে কুরআনের মাপকাঠিতে প্রয়োগ করে এবং তদনুযায়ী দেখতে পেয়ে পরিত্যাগ করেন। অতএব তিনি (আঃ) হাকীকাতুল ওহীতে লিখেন ঃ

"যদিও খোদাতাআলা বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকে আমার নাম ঈসা রাখেন আর আমাকে এটাও বলেন, তোমার আসার সংবাদ খোদা ও রসূল (সঃ) দিয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু মুসলমানদের একটি দল এ বিশ্বাসে ঐকমত্য হয়েছিল আর আমারও এ বিশ্বাসই ছিল, হযরত ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবেন, তাই আমি খোদার ওহীকে বাহ্যিকভাবে প্রয়োগ করতে চাইলাম না বরং সেই ওহীর ব্যাখ্যা করলাম এবং নিজের ধর্মবিশ্বাস সেটাই রাখলাম যা সাধারণ মুসলমান পোষণ করতেন। আর এটা বারাহীনে আহমদীয়াতে প্রকাশ করি। কিন্তু পরে এর ওপর বৃষ্টি ধারার ন্যায় খোদার ওহী অবতীর্ণ হয়, সেই আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ্ তুমিই। এর সাথে শত শত নিদর্শন প্রকাশিত হলো। আকাশ ও পৃথিবী উভয়ই আমার সত্যায়নের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে গেল এবং খোদার অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন আমার ওপর শক্তি প্রয়োগে আমাকে এদিকে নিয়ে আসে, শেষ যুগে আগমনকারী মসীহ আমিই নচেৎ আমার ধর্ম বিশ্বাস তো তা-ই ছিল যা আমি বারাহীনে আহমদীয়াতে লিখে দিয়েছিলাম। আবার আমি একে যথেষ্ট মনে না করে এ ওহীকে কুরআন শরীফের প্রতি আরোপ করলাম তখন অকাট্য দলীল দিয়ে সাব্যস্ত হলো যে, প্রকৃতপক্ষে মসীহ্ ইবনে মরিয়ম মারা গিয়েছেন এবং শেষ খলীফা মসীহ্ মাওউদ নামে এ উম্মত থেকে আসবে আর যেভাবে সূর্য উঠলে কোন আঁধার থাকে না সেভাবেই শত শত নিদর্শন, ঐশী সাক্ষ্য ও কুরআন শরীফের অকাট্য দলীল-প্রমাণ সম্বলিত আয়াত এবং কুরআনী আয়াতের ভিত্তিতে সুস্পষ্ট হাদীসগুলো আমাকে মসীহ মাওউদ বলে নিতে বাধ্য করলো। আমার প্রতি তাঁর সন্তুষ্টি থাকা আমার জন্যে যথেষ্ট ছিল। আমার এ ব্যাপারে কোন বাসনাই ছিল না। আমি গোপনীয়তার কক্ষে ছিলাম। আমাকে কেউ জানতো না। আমাকে কেউ

সনাক্ত করুক এটাও আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল না। তিনি আমাকে একাকিত্বের নিভৃত কোণ থেকে জোর করে বের করলেন। আমি গোপন থাকতে চেয়েছিলাম আর গোপনে মরতেই চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি বললেন, আমি তোমাকে সারা জগতে মর্যাদার সাথে খ্যাতি দিব। অতএব এটা সেই খোদাকে জিজ্ঞেস কর, 'তুমি এটা কেন করলে?' আমার এতে কী অপরাধ?" (হাকীকাতুল ওহী, পৃষ্ঠা ১৪৯)।

এ উদ্ধৃতি থেকেও এটা সাব্যস্ত হয়, আহমদী জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার মসীহ মাওউদ হওয়ার দাবী তাঁর প্রতি ইসলামগুলোর ভিত্তিতে। এগুলো কুরআন ও নবী করীম (সঃ)-এর হাদীসগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রাখে। কোন ব্যক্তির কোন প্রস্তাব বা তার পরামর্শের ভিত্তিতে নয় ; হোন না তিনি হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন (রাঃ) বা অন্য কেউ। মৌলভী আবুল হাসান নদভী সাহেবের মতবাদে সুস্পষ্ট স্ববিরোধিতা দেখা যায়। কখনও তিনি বলেন, মির্যা সাহেব (আঃ) হাকীম নূরুদ্দীন (রাঃ)-এর প্রস্তাবকে গ্রহণ করেছেন এবং মসীলে মসীহ্ দাবী করে বসেছেন। আবার কখনও তিনি বলেন, তিনি (আঃ) তার প্রস্তাবকে গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করেছেন এবং সাথে সাথে এ প্যাঁচ লাগিয়ে দেন ঃ

"এ পরামর্শের প্রকৃত উপকরণ ও কার্যকারিতা কী ছিল? এ কি হাকীম সাহেবের দুরর্দৃষ্টি ও বিচক্ষণতা বা দুঃসাহসী চরিত্রেরই ফল অথবা এটা সমসাময়িক সরকারের ইঙ্গিতে ছিল" (কদিয়ানিয়্যত, পৃষ্ঠা ৬৭)।

মসীহ্ মাওউদ-এর দাবী সরকারের ইঙ্গিতে ছিল না

আমরাতো এটা বলে দিয়েছি,হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব (রাঃ)-এর পরমর্শকে তিনি (আঃ) নাকচ করে দিয়েছিলেন আর তাঁর পরমার্শের বিপরীতে তিনি নিজেকে নিজে 'দামেষ্ক সম্বলিত' হাদীসে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি নির্ধারিত করে দিয়েছেন। আর আমরা এটাও বলে দিয়েছি, তাঁর মসীলে মসীহ বা মসীহ্ মাওউদ হওয়ার দাবী নিজ ইলহামগুলোর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। যদিও এখন এমন কোন সন্দেহের সুযোগ অবশিষ্ট থাকে না যে, তাঁর (আঃ) দাবী হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব (রাঃ)-এর দূরদর্শিতা বা সমসাময়িক সরকারের ইঙ্গিতে ছিল।

এটা তো সুস্পষ্ট হয়েছে, 'দামেষ্ক সম্বলিত' হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব (রাঃ)-এর হাদীস সম্পর্কে পরামর্শ আহমদী জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা গ্রহণ করেন নি। আর একথা মধ্য দিনের দিবাকরের ন্যায় প্রমাণিত যে, ইংরেজ খৃষ্টান সরকার তাঁকে (আঃ) মসীলে মসীহ্ বা মসীহে মাওউদ-এর দাবী করার ইঙ্গিত করতে পারতো না। কেননা, এমন দাবী ছিল তাদের ধর্ম বিশ্বাসের সুস্পষ্ট বিরোধী। ইংরেজ সরকার ছিল খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী। তারা প্রটেস্ট্যান্ট দলের সাথে সম্পর্ক রাখতো। মসীহ্ ক্রুশে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন–এটা তাদের ধর্মবিশ্বাস। আর তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যুর ওপর বিশ্বাস স্থাপনকারীদের ব্যাপারে প্রায়শ্চিত্ত ছিল এটা। তিনি ৩ দিন পর জীবিত হয়ে ওঠেন। পরে আকাশে উঠে যান। আর খোদার ডান হাতে বসে আছেন। আর তিনি স্বয়ংই শেষ যুগে আকাশ থেকে নেমে আসবেন এবং জাতিগুলোর মাঝে বিচার-নিষ্পত্তি করবেন। খৃষ্টান সরকার এ ধর্ম-বিশ্বাস পোষণ করতে থেকে একজন মুসলমানকে এই বলে ইঙ্গিত করে যে, তুমি মসীহ্ মাওউদ হওয়ার দাবী করো, কিভাবে নিজ ধর্মের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারে? অথচ তারা এটা শুনে যে, একজন মুসলমান তৌহীদের পূজারী এবং মসীহকে খোদার পুত্র মনে করে না। একজন মুসলমান যদি এ দাবীতে সফলতা লাভ করে তাহলে তো খৃষ্ট ধর্মেরই মূলোচ্ছেদ হয়ে যায়। অতএব একথা বলা মৌলভী আবুল হাসান নদভী সাহেবর মস্তিষ্ক বিকৃতির ফল যে, তিনি (আঃ) ইংরেজ সরকারের ইঙ্গিতে মসীহ্ মাওউদ হবার দাবী করেছেন। কেননা, এমন দাবী সুস্পষ্টভাবে ইংরেজ সরকারের ধর্মীয় স্বার্থের পরিপন্থী। আর এক জন মুসলমান কর্তৃক এমন দাবী অবশ্যই ক্রুশীয় ধর্মকে টুকরো টুকরো করে দিতে বাধ্য। ইংরেজ সরকার এত নির্বোধ ছিল না। তারা নিজেদের ধর্মের বিরুদ্ধে এমন পদক্ষেপ রাখতে পারে না। অতএব আহমদী জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার প্রতি নদভী সাহেবের যে বিদ্বেষ তা এর সাথে এমন পরস্পর বিরোধী ও ভিত্তিহীন কথা-বার্তা লিখেছেন যে, এর কোন প্রমাণ তার কাছে নেই। যখন আবুল হাসান সাহেব নদভীর নিরর্থক ধ্যান-ধারণার রদ করা হয়ে গেল তখন আহমদী জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা সম্বন্ধে এ কথা লেখা তার অবশ্যকর্তব্য ঃ

"তার পত্র থেকে যে আত্ম-বিনাশন, সদাচরণ ও ঐশী ভীতি প্রকাশ পেয়ে থাকে তা খুবই প্রশংসার দাবী রাখে আর এতে মির্যা সাহেবের মর্যাদায় যথোচিত প্রবৃদ্ধি ঘটে থাকে"।

এতদনুযায়ী তাঁর মহত্ত্বের পরিচয় নিন। তিনি নিজ পুস্তক 'কাদিয়ানিয়্যত'-এর ৪৭ পৃষ্ঠায় স্বয়ং বারাহীনে আহমদীয়া থেকে একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেছেন। এতে প্রকাশিত হয়, তিনি বারাহীনে আহমদীয়াতে মসীলে মসীহ্-এর দাবী করে রেখেছেন। সে উদ্ধৃতিটি এরূপ ঃ

"এ অধম সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু-এর পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট হয়েছি যেন নাসেরী নবী ইসরাঈল (মসীহ্)-এর কার্যপদ্ধতিতে দীনতা, দরিদ্রতা, নম্রতা এবং বিনয়ের সাথে সৃষ্টি-সেবার জন্যে চেষ্টা করে" (বারাহীনে আহমদীয়ায় উল্লেখিত বিজ্ঞাপন)।

অতএব এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে, আহমদী জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার মসীলে মসীহ্ ও মসীহ্ মাওউদ-এর দাবী আল্লাহ্তাআলার পক্ষ থেকে ছিল। আর যেদিন তিনি প্রত্যাদিষ্ট হলেন তিনি সৃষ্টির সংশোধনের জন্যে নিজ প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার ঘোষণা দেন এবং তাঁর প্রতি এ ইলহামও অবতীর্ণ হয় ঃ

কুল ইন্নী উমিরতু ওয়া আনা আওওয়ালুল মু'মিনীন-কুল জায়াল হাক্কু ওয়া যাহাক্বাল বাতিলা-ইন্নাল বাতিলা কানা যাহূক্বা-কুলু বারাকতিম্মিম মুহাম্মাদিন সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-ফাতাবারাকা মান 'আল্লামা ওয়া তাআল্লামা–অর্থাৎ বল, নিশ্চয় আমি প্রত্যাদিষ্ট হয়েছি আর আমি প্রথম মু'মিন। তুমি বল, সত্য এসেছে আর মিথ্যা পলায়ন করেছে আর মিথ্যা অবশ্যই পলায়ন করে থাকে। সব কল্যাণ মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে। অতএব কল্যাণমন্ডিত সে, যে শিখায় ও শিখে (বারাহীনে আহমদীয়া) (চলবে)।

অনুবাদ - আলহাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)

(৪র্থ কিস্তি)

নিজ বিবিগণের (রাঃ) প্রতি হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর আচরণ

আপন বিবিগণের প্রতি তাঁর (সঃ) আচরণ ছিল অতীব নম্র এবং ন্যায়-ভিত্তিক। কোন কোন সময় তাঁর স্ত্রীরা (রাঃ) তাঁর প্রতি কঠোরতাও পদর্শন করতেন। কিন্তু, তিনি কিছু না বলে হেসেই উড়িয়ে দিতেন। একদিন তিনি হযরত আয়েশাকে (রাঃ) বললেন, এ্যায় আয়েশা! যখন তুমি আমার প্রতি অভিমান কর, তখন আমি ঠিকই বুঝতে পারি যে, তুমি অভিমান করে আছ।' হযরত আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে আপনি তা বুঝতে পারেন?' তিনি (সঃ) বললেন, 'যখন আমার ওপরে খুশী থাক, আর কোন কারণে কসম খাওয়ার প্রয়োজন পড়ে, তখন তুমি সব সময়ই বল যে, 'মুহাম্মদ-এর খোদার কসম, কথাটা এটাই। আর যখন তুমি আমার প্রতি নারাজ থাক এবং কসম খাওয়ার প্রয়োজন পড়ে, তখন তুমি বলে থাক, ইব্রাহীমের খোদার কসম, কথাটা এটাই'। এই কথা শুনে হযরত আয়েশা হেসে ওঠলেন এবং বললেন 'ঠিক কথা, আপনি ঠিকই ধরেছেন'। (বুখারী)

হযরত খাদিজা (রাঃ), যিনি ছিলেন তাঁর (সঃ) বড় বিবি এবং যিনি তাঁর (সঃ) জন্য বড় বড় কোরবানী করেছিলেন, তাঁর (রাঃ) ইন্তেকালের পরে আঁ হযরত (সঃ) কয়েকটি বিয়ে বা নেকাহ্ করেছিলেন। এই বিবিরা (রাঃ) থাকা সত্ত্বেও তিনি (সঃ) কখনই হযরত খাদিজার সঙ্গে তাঁর বিশেষ সম্পর্কের কথা ভুলে যাননি। হযরত খাদিজার (রাঃ) বান্ধবীরা যখনই আসতেন তিনি (সঃ) তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন। (মুসলিম)। হযরত খাদিজার (রাঃ) হাতের তৈরী কোন জিনিস যদি তাঁর (সঃ) সামনে এসে যেত, তাঁর চোখ অশ্রুতে ভরে ওঠতো।

বদর-এর যুদ্ধে তাঁর (সঃ) এক জামাতা যুদ্ধ বন্দীরূপে এসেছিলেন। মুক্তিপণ পরিশোধ করার মত কোন সম্পদ তাঁর ছিল না। তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেয়ে যখন দেখলেন যে, স্বামীকে মুক্ত করে আনবার মত কোন সম্পদ তাঁর কাছে নেই, তখন তিনি তাঁর মায়ের শেষ স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ যে হারখানি তাঁর কাছে ছিল, সেই হারখানি তিনি তার স্বামীর মুক্তিপণ হিসেবে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। সেই হারখানা যখন রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে পেশ করা হলো তখন তিনি সেই হার চিনতে পরলেন। তাঁর দুচোখ ভরে অশ্রু এলো। তিনি সাহাবাদেরকে বললেন, 'আমি আপনাদেরকে হুকুম তো দিচ্ছি না, কেননা এইরূপ হুকুম দেওয়ার কোন অধিকার আমার নেই, কিন্তু আমি জানি যে, এই হারটি যয়নব-এর কাছে ছিল তার মায়ের শেষ স্মৃতিচিহ্ন রূপে। যদি আপনারা খুশী মনে এটা করতে পারেন তো আমি সুপারিশ করছি, মেয়েকে তার মায়ের শেষ চিহ্ন থেকে বঞ্চিত না করতে।" সাহাবারা (রাঃ) বললেন, 'ইয়া রসূলুল্লাহ! আমাদের জন্য এর চাইতে খুশীর বিষয় আর কি হতে পারে?' তারা হারখানি হযরত যয়নব (রাঃ)-এর কাছে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন। (হালবিয়া)

হযরত খাদিজার (রাঃ) কোরবানীসমূহের প্রভাব তাঁর (সঃ) উপরে এত বেশি ছিল যে, তিনি (সঃ) তাঁর অন্য বিবিদের (রাঃ) সামনে প্রায়শঃ তাঁর (রাঃ) কোন কোন পুণ্যকাজের বর্ণনা করতেন। এভাবেই একদিন তিনি (সঃ) হযরত আয়েশার (রাঃ) সামনে হযরত খাদিজার (রাঃ) কোন নেকীর অর্থাৎ পুণ্যকাজের বর্ণনা দিচ্ছিলেন। এতে হযরত আয়েশা খানিকটা গোশ্বা করেই বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্! আপনি ওই বুড়ীর স্মৃতিচারণ ছেড়ে দিন তো! আল্লাহ্তাআলা আপনাকে তো তার চাইতে উত্তম জওয়ান ও সুন্দরী স্ত্রীদেরকে দিয়েছেন? এ কথা শুনে আবেগে উত্তেজিত হয়ে ওঠলেন রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তিনি বললেন, 'আয়েশা তুমি ধারণাই করতে পারবে না যে, খাদিজা আমার জন্য কী করেছে (বুখারী)।

উত্তম চারিত্র্য

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বভাব ছিল অত্যন্ত সাদাসিদে। কখনই কোন দুঃখ কষ্টে তিনি ঘাবড়াতেন না। কখনো কোন আকাংখা সীমাতিরিক্ত আশান্বিত হতেন না। জীবনী গ্রন্থগুলোতে বলা হয়েছে যে, তাঁর জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতা মারা যান এবং শৈশবেই তিনি মাকেও হারান। আট বছর পর্যন্ত তিনি তাঁর দাদার তত্ত্বাবধানে ছিলেন। এরপর তিনি তাঁর চাচা আবু তালেব-এর অভিভাবকত্বে লালিত-পালিত হন। চাচার সঙ্গে তাঁর রক্তের সম্পর্ক তো ছিলই, তদুপরি তাঁর পিতা মৃত্যুর সময় রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বিশেষ করে ওসিয়্যতও করে গিয়েছিলেন। এজন্য তিনি রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লামকে বিশেষভাবে ভালবাসতেন এবং তাঁর প্রতি খেয়াল রাখতেন। কিন্তু চাচীর মধ্যে না ছিল তেমন স্নেহ মমতা, না বংশগত দায়িত্ববোধ। বাড়ীতে যখন কোন ভাল কিছু আনা হতো, তখন অনেক সময় তিনি তাঁর বাচ্চাদেরকেই আগে তা দিয়ে দিতেন এবং রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা খেয়ালই করতেন না। আবু তালিব বাড়ীর ভেতরে এসে তার ছোট্ট ভাতিজাটিকে কান্নাকাটি বা চিল্লাচিল্লি করতে দেখতেন না। বরং তিনি দেখতে পেতেন যে, তাঁর বাচ্চারা তো কিছু একটা খাচ্ছে, কিন্তু তাঁর সেই ছোট্ট ভাতিজাটি গুটিশুটি হয়ে এক পাশে বসে আছে। চাচার মমতা এবং খান্দানের দায়িত্ব ও জিম্মাদারী তাঁর সামনে ভেসে ওঠতো তনি দৌড়ে গিয়ে ভাতিজাকে কোলে তুলে নিতেন, এবং বলতেন 'আমার বাচ্চাটার দিকেও তো একটু খানি খেয়াল করো !' এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটতো। কিন্তু যারা দেখতো তারা বলেছে যে, রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম না কখনো অভিযোগ অনুযোগ করতেন, না তাঁর চেহারাতে কোন বিষন্নতা প্রকাশ পেত ; না তাঁর চাচাতো ভাইদের সঙ্গে কোন মন কষাকষি হতো। বরং তাঁর জিন্দেগী এই

সাক্ষ্যই দান করে যে, কীভাবে তিনি তাঁর পরিবর্তিত অবস্থায়, হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত জাফর (রাঃ)-এর অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং কীভাবে তাঁদের উত্তম তরবিয়ত দান করেছিলেন, লাল-পালন করেছিলেন।

রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জিন্দেগী পার্থিব প্রেক্ষিতে বলতে কি, নানান দুঃখ-কষ্টের মধ্যেই অতিবাহিত হয়েছে। জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতা মারা যান, এবং শৈশবকালেই মা ও দাদা একজনের পরে একজন মারা যান। তারপর, বিয়ে শাদী করলেন তো বাচ্চা-কাচ্চারাও একটার পর একটা মারা যেতে থাকলো। এরপর, কয়েকজন স্ত্রীও একের পর এক মারা গেলেন। এঁদের মধ্যে হযরত খাদিজা রাযি আল্লাহু আনহার মত প্রেমময়ী, স্বামী গতপ্রাণ, মহীয়সী মহিলাও ছিলেন। কিন্তু তিনি এই সমস্ত দুঃখ-বেদনাই খুশী মনেই বরদাস্ত করেছেন। এবং এই সকল ব্যাথা-বেদনার ভারে না তিনি ভেঙ্গে পড়েছিলেন, না এতে তাঁর খোলা-মেজাজের প্রতি কোন প্রভাব পড়েছিল। চোখে তাঁর আহমদ হৃদয়ের ছাট যেত না। প্রত্যেকের সামনে তিনি প্রফুল্লই থাকতেন। কদাচিৎ কোন উপলক্ষ্যে প্রাণের ব্যাথা প্রকাশ করতেন। একবার একজন স্ত্রীলোক-যার ছেলে মারা গিয়েছিল–সে তার ছেলের কবরের পাশে মাতম করছিল। রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন, বললেন ঃ এ্যায়, মেয়ে লোক! সবর করো, প্রত্যেকেই তো খোদার হুকুমে যেতে হবে। ঐ স্ত্রীলোকটি রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চিনতো না। সে জবাব দিল, 'যেভাবে আমার বাচ্চা মারা গেছে, সেভাবে তোমার বাচ্চাও যদি মারা যেত, তাহলেই বুঝতে পারতে সবর কাকে বলে।' রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই কথা বলে ওখান থেকে চলে গেলেন, 'একটা নয় আমার তো সাত সাতটি বাচ্চা মারা গেছে।' (আবুদাউদ) এই ধরনের ঘটনার উপলক্ষ্যে কখনো কখনো শুধু এতটুকুই প্রকাশ করতেন রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর অতীতের কোন দুঃখ-বেদনা সম্পর্কে। এর দরুন, তাঁর মানবজাতির খেদমতের ক্ষেত্রে না কোন ভাটা পড়েছিল, না তাঁর চিত্তের প্রফুল্লতায় কিছু কমবেশী হয়েছিল।

সহিষ্ণুতা

সহিষ্ণুতা তাঁর (সঃ) মধ্যে এত অধিক ছিল যে, খোদাতাআলা যে সময় তাঁকে রাজত্ব দান করলেন, সেই সময়কালেও তিনি প্রত্যেকটি লোকের কথা শুনতেন। কোন ব্যক্তি কঠোরতা প্রদর্শন করলেও তিনি চুপ করেই থাকতেন, কখনই কঠোরতার বিরুদ্ধে কঠোরতা প্রদর্শন করতেন না।

মুসলমানরা তাঁকে তাঁর নাম ধরে ডাকার পরিবর্তে তাঁর আধ্যাত্মিক মর্যাদা উল্লেখ করে ডাকতেন। অর্থাৎ তাঁরা ইয়া রসূলুল্লাহ্ বলে তাঁকে ডাকতেন। এবং অন্যান্য ধর্মের লোকেরা, ইশ্ইয়ায়ী রীতি অনুযায়ী, তাঁর প্রতি শিষ্টাচার ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁকে তাঁর নাম ধরে ডাকার পরিবর্তে 'আবুল কাসেম' বলে ডাকতো। (আবুল কাসেম অর্থ কাসেমের পিতা ; তাঁর এক পুত্রের নাম ছিল কাসেম)। একবার এক ইহুদী মদীনায় এসে আঁ হযরত (সঃ)-এর সঙ্গে বাহাস শুরু করে দিল। বাহাসের মধ্যে সে বার বার বলছিল, এ্যায় মুহাম্মদ! কথাটা তো এ রকম!এ্যায় মুহাম্মদ! কথাটা তো এ রকম!' রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন ভ্রুক্ষেপ না করে তার কথার জবাব দিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সাহাবারা (রাঃ) তার স্পর্ধা দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। শেষে, একজন সাহাবী আর সইতে পারলেন না। তিনি ঐ ইহুদীকে বললেন, 'খবরদার। তাঁর (সঃ) নাম ধরে কথা বলবে না। তুমি 'রসূলুল্লাহ্' বলতে না পার তো কমসে কম 'আবুল কাসেম তো বলো!' ইহুদী লোকটি বললো, আমি তো সেই নামই নিচ্ছি, যা তাঁর বাপ-মা রেখেছে তার জন্য। রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচ্কি হাসলেন এবং তাঁর সাহাবাকে বললেন, 'দেখো! এ ঠিক বলছে, আমার বাপ-মা আমার নাম 'মুহাম্মদ'-ই রেখেছেন। যে নাম সে নিতে চাচ্ছে, নিতে দাও। ওর ওপর রাগ করো না।'

তিনি (সঃ) যখন কাজের উদ্দেশ্যে বাইরে রওয়ানা হতেন, তখন পথিমধ্যে লোকজন তাঁর পথ আগ্লিয়ে দাঁড়িয়ে যেত এবং তাদের নানান প্রয়োজনের কথা বলতে থাকতো। যতক্ষণ পর্যন্ত লোকেরা তাদের প্রয়োজনের কথা বলা শেষ না করতো, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়ে তাদের কথা শুনতেন। তাদের বক্তব্য শেষ হওয়ার পরে তিনি আবার রওয়ানা দিতেন। এমনিভাবে কোন কোন লোক মুসাফাহা করার সময়ে বহুক্ষণ পর্যন্ত তাঁর হাত ধরেই থাকতো। যদিও ব্যাপারটা অপসন্দনীয় বটে, এবং কাজেকর্মে বাধারও সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনই ওদের হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিতে না, বরং যতক্ষণ পর্যন্ত সেই মুসাফাহ্কারী তাঁর হাত ধরেই থাকতো, ততক্ষণ তিনিও তাঁর হাত ঐ ব্যক্তির হাত থেকে সরায়ে নিতেন না। সব ধরনের অভাবী ও হাজতমন্দ ঠেকে পড়া ব্যক্তিরা তাঁর কাছে আসতো এবং তাদের প্রত্যেকের অভাব-অভিযোগ ও প্রয়োজনের কথা তাঁকে বলতো। কখনো কখনো তিনি কোন প্রার্থীকে তার প্রয়োজনমত কিছু দিয়ে দেওয়ার পরও যদি সে লোভের বশে আরও কিছু চাইতো তাহলে তিনি আবারও কিছু তাকে দিয়ে দিতেন। এবং তাঁর ইচ্ছা পূরণ করতেন। কখনো কখনো এমনও হয়েছে যে, লোকেরা বার বার চাইতে এসেছে, এবং তিনি প্রত্যেক বারই তাদেরকে কিছু না কিছু দান করেছেন।

যে ব্যক্তিকে তাঁর বিশেষ করে মোখলেস বা সৎলোক বলে মনে হতো তাকে তার চাওয়া জিনিস দিয়ে দেওয়ার পরে তাকে তিনি স্রেফ এতটুকুই বলতেন যে, কতই না ভাল হতো যদি তুমি খোদার ওপরেই তাওয়াক্কুল রাখতে, ভরসা করতে। এমনিভাবে, একজন মোখলেস – নিষ্ঠাবান সাহাবী একের পর এক দাবী করে তাঁর কাছে কয়েকবার তার প্রয়োজনের কথা বলে টাকা-পয়সা চেয়েছিল। তিনি (সঃ) তার খায়েশ বা যাচঞা তো পূরণ করে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু শেষে বলে দিয়েছিলেন যে, সর্বাপেক্ষা উত্তম অবস্থা তো সেটাই যে, মানুষ যেন খোদার ওপরেই ভরসা করে। এই সাহাবার মধ্যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা ছিল, এবং শিষ্টাচারও ছিল, যা কিছু সে নিয়েছিল আদরের খাতিরে সে তা ফেরৎ দেয় নি। কিন্তু, আগামীর জন্য সে আবেদন করলো, 'ইয়া রসূলুল্লাহ্! এটাই আমার শেষ কথা,

আগামীতে আমি আর কারো কাছে কোন অবস্থানেই কিছু চাইব না।' একবার এক যুদ্ধ হচ্ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়ংকর অবস্থা বিরাজ করছিল। নেজা বল্লম নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। তরবারি খটাখট্ শব্দ হচ্ছিল। ঘাড়ে ঘাড়ে ধাক্কা লাগছিল। সিপাহীর ওপরে সিপাহী ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। এই রকম পরিস্থিতিতে উক্ত সাহাবীর হাত থেকে, যখন তিনি শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর কোড়াটি পড়ে যায়। পাশের একজন পদাতিক সৈন্য মনে করলো যে, অফিসারটি যদি (ঘোড়া থেকে) নেমে পড়েন তাহলে তাঁর ভীষণ ক্ষতি হতে পারে। তাই, সে ছোঁ মেরে কোড়াটি উঠিয়ে তাঁর হাতে দিতে চেষ্টা করছিল। ঐ সাহাবীর নজর উক্ত সিপাহীর ওপরে পড়লো। তিনি বললেন, 'হে আমার ভাই! তোমাকে আল্লাহ্‌র কসম! তুমি ঐ কোড়াতে হাত লাগাবে না।' এই কথা বলতে বলতে তিনি ঘোড়ার ওপর থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন এবং কোড়াটি উঠিয়ে নিলেন। তারপর তাঁর ঐ সাথীকে বললেন, 'আমি রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অঙ্গীকার করেছিলাম যে, আমি কারো কাছেই কোন সাহায্য চাইব না। আমি যদি তোমাকে কোড়াটি উঠাতে দিতাম, যদিও আমি তোমার কোন সাহায্য চাই নি, তবু বর্তমান পরিস্থিতিতে এটাকে নিঃসন্দেহে চাওয়াই বলা যেত–তাহলে এটা করাতে আমি ওয়াদা ভঙ্গকারী হয়ে যেতাম। যদিও এটা যুদ্ধের ময়দান, তথাপি আমার কাজ আমিই করবো।

ইনসাফ বা সুবিচার

ইনসাফ ও আদল–সুবিচার ন্যায়পরায়ণতা –তাঁর (সঃ) মধ্যে এত বেশি ছিল যে, তার দৃষ্টান্ত দুনিয়ার কোথাও পাওয়া যায় না। আরবে স্বজনপ্রীতি এবং সুপারিশ গ্রহণ করা ছিল এক প্রকার সাধারণ বা সংক্রামক ব্যাধি। আরবের কথা তো আছেই, সে যুগেই সুসভ্য দেশগুলিতেও দেখা যেত যে,বড় বড় লোকদেরকে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে সবাই ইতস্ততঃ করতো, ভয় পেতো ; কিন্তু গরীবদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে কেউ ভয় পেত না। একবার এক মকদ্দমা এলো তাঁর (সঃ) কাছে। এক খুব বড় সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক মহিলা অপর লোকের জিনিস নিয়ে গিয়েছিল (চুরি করেছিল), যখন বিষয়টা জানা জানি হয়ে গেল, তখন আরবদের মধ্যে দারুন টেন্‌শন ও উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। কেননা এতে করে, অনেক বড় সম্মানিত এক খান্দানের বেইজ্জতি হয়ে যাবে। তারা চাইলো যে, তারা রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এই দরখস্ত পেশ করবে, যেন এই মহিলাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। কেউ অবশ্য সাহস পেল না। তবে, রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক এক স্নেহের পাত্র আসমা বিন যায়েদকে (রাঃ) লোকেরা খুব করে ধরলো, যেন তিনি রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ঐ মহিলার জন্যে সুপারিশ করেন। আসমা রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে কথাটা পাড়তে না পাড়তেই তাঁর (সঃ) চেহারায় ক্রোধের চিহ্ন ফুটে ওঠলো , এবং তিনি বললেন, আসমা! তুমি এটা কী বলছো! অতীতের জাতিগুলি তো এ জন্যই ধ্বংস হয়ে গেছে যে, তারা বড় লোকদের খাতির করতো এবং গরীবদের প্রতি যুলুম করতো। ইসলামতো এসবের কোন অনুমতি দেয় না। এবং আমি তো এটা কোন মতেই করতে পারবো না। আল্লাহ্‌র কসম! যদি আমার মেয়ে ফাতেমাও এ ধরনের অপরাধ করতো, তাহলে তাকেও আমি শাস্তি না দিয়ে ছাড়তাম না। (বুখারী)

এই ঘটনাও ইতোপূর্বে তার জীবনী [নবীনেতা মুহাম্মদ মুস্তফা-(সঃ)] গ্রন্থ উল্লেখ করা হয়েছে যে, বদর-এর যুদ্ধে যখন হযরত আব্বাস (সঃ) বন্দী হয়ে এসেছিলেন এবং বন্দী অবস্থায় কষ্টে কাৎরাচ্ছিলেন, তখন তিনিও (সঃ) মনে মনে দারুন কষ্ট পাচ্ছিলেন। সাহাবারা তাঁর এই মনোকষ্ট লক্ষ্য করে যখন হযরত আব্বাসের (রাঃ) হাতের বাঁধন খুলে দিলেন এবং বিষয়টা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝতে পারলেন, তখন তিনি বললেন, আমার আত্মীয় যেমন অন্যদের আত্মীয়রাও তেমনি। হয় তোমরা আমার চাচা আব্বাসকে পুনরায় রশি দিয়ে বাঁধো, নয়তো সকল বন্দীদের বাঁধান খুলে দাও।' সাহাবাদের (রাঃ) যেহেতু রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনোকষ্টের কারণ অনুভব করতে পারছিলেন, সেহেতু তাঁরা বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমরা কড়া পাহাড়া লাগাব। কাজেই আমরা সমস্ত বন্দীর বাঁধন খুলে দিচ্ছি।' অতঃপর প্রত্যেকটি বন্দীর বাঁধন তাঁরা খুলে দিলেন। তিনি (সঃ) যুদ্ধের সময়েও সুবিচার রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখতেন। একবার তিনি কিছু সংখ্যক সাহাবীকে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন খবরা-খবর সংগ্রহের জন্য। শত্রুপক্ষের কিছু লোকের সঙ্গে তাঁরা মুখোমুখি হলেন পবিত্র মাসের (রজব-এর) শেষ তারিখে। সাহাবারা মনে করলেন যে, আমরা যদি এদেরকে জীবিত ছেড়ে দেই তাহলে এরা ফিরে গিয়ে মক্কাবাসীদেরকে খবর দিবে, এবং আমরা মারা পড়বো। কাজেই তাঁরা (রাঃ) ওদের ওপরে হামলা চালালো। ফলে, তাদের মধ্যে একজন এই যুদ্ধে মারা গেল। যখন এই খবর সংগ্রহকারী কাফেলাটি মদীনা ফিরে এলো, তখন তাদের পিছে পিছে মক্কাবাসীদের তরফ থেকে একটি প্রতিনিধি দল এই অভিযোগ নিয়ে হাজির হলো যে, এরা পবিত্র মাসের মধ্যে আমাদের দুজন মানুষকে হত্যা করেছে। অথচ, এই লোকগুলিই সব পবিত্র মাসের মধ্যেও সব সময় রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামের ওপরে অত্যাচার চালিয়েছিল। কাজেই, তাদের তো এই জবাবই পাওয়ার কথা যে, তোমরা কবে পবিত্র মাসের সম্মান দেখিয়েছ যে, তোমরা আমাদের কাছে এই সম্মানের দাবী করছ? কিন্তু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম সেই জবাব দিলেন না, বরং বললেন, 'হা বে ইনসাফী হয়ে গেছে। কেননা, এটা সম্ভব যে ওরা হয়তো মনে করেছিল যে, ওরা পবিত্র মাসের মধ্যে আক্রান্ত হবে না। কাজেই, ওরা হয়তো আত্মরক্ষার তেমন চেষ্টাও করেনি। ফলে, রক্তপাতের ঘটনা ঘটে গেছে।' যাহোক,তিনি (সঃ) আরবের প্রথা অনুযায়ী সেই হত্যার জন্য রক্তপণ আদায় করে দিলেন ওদের উত্তরাধিকারীদের কাছে।

(চলবে)

মূল ঃ হযরত মীর্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)
অনুবাদ – **শাহ্ মোস্তাফিজুর রহমান**

আহমদীয়াত ইয়ানী হাকীকী ইসলাম (আহমদীয়াত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলাম)

হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রাঃ)

(১৭তম কিস্তি)

ইলহামের এই শ্রেণীবিন্যাস ছাড়া দুটি আরও শ্রেণীভাগ রয়েছে যা মানুষের ভাষায় নাযেল না হয়ে কাল্পনিক ভাষায় নাযেল হয়ে থাকে। এর মধ্যে এক ধরনের ইলহামকে স্বপ্ন বলা হয় যা গভীর ঘুমের সময় হয়। আর এতে সব বিষয় কেবল কাল্পনিকভাবেই হয়ে থাকে যেমন উদাহরণ স্বরূপ স্বপ্নে দুধ দেখানোর অর্থ হলো জ্ঞান। মহিষ দেখানো হলে এর অর্থ রোগ ব্যাধি ও পরাজয় হবে। দ্বিতীয় ধরনের ইলহাম হলো 'কাশফ'। এটি প্রকাশিত হওয়ার পদ্ধতি হলো মানুষ পূর্ণ আবেগে কিছু মৃত ব্যক্তিদের সাথে আত্মিকভাবে সাক্ষাত করে নেয় অথবা কিছু এমন ঘটনা যা অন্য কোন স্থানে ঘটছে, সে দেখে ফেলে অথচ নিজ স্থানে সে নিজের কাজে ব্যস্ত। এ ধরনের চিত্রকে বা কল্পনাকে ইসলামের পরিভাষায় 'কাশফ' বলে। ইলহামের এ সমস্ত ধরন কুরআন করীম হতে প্রমাণিত। কিন্তু এর বিস্তারিত বর্ণনা এই বক্তৃতাকে অনেক দীর্ঘ করে দিবে।

মোটকথা এমনিতেই মনে কোন চিন্তার উদ্রেক হলে তা ইলহাম, ইসলাম ইলহামের এমন বিশ্লেষণ করে না। ইলহাম হতে দূরে থাকা ও অপরিচিত থাকার কারণেই এমন ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। আর যদি এই ব্যাখ্যাকে সঠিক হিসাবে ধরে নেয়া হয় তাহলে ইলহামের আসল মর্যাদার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। শুধু ধারণা ও মনের চিন্তাধারা তো দুনিয়ার সব মানুষের মনেই সৃষ্টি হতে পারে। যদি এই চিন্তা ইলহাম হয় তাহলে যে কারো মনে যে চিন্তাই আসবে সে সেটাকে ইলহাম হিসাবে বলে দিতে পারে। যদি এমনই হয় তাহলে দুনিয়ার সকল গ্রন্থ ইলহামী গ্রন্থ হিসাবেই প্রকাশিত হতো। খোদাতাআলার কালাম তো তা-ই হওয়া উচিত যা কু-ধারণা ও কল্পনার রাস্তা না খুলে বিশ্বাস ও একমাত্র নির্ভরযোগ্য ভরসার রাস্তা সৃষ্টি করবে। মনের চিন্তা ও ধ্যান ধারণা যদি ইলহাম হতো; বাক্যালাপের মাধ্যমে যদি ইলহাম না হতো, তাহলে অনেক লোক এই সমস্যায় পড়ত, যার মনে যে ধারণাই জন্মাচ্ছে সে সেটাকে ইলহাম মনে করে নিবে। আল্লাহ্‌তাআলার তরফ হতে যে কালাম আসে তার মাঝে তো এতটুকু পার্থক্যের বিষয় থাকা উচিত যেন চিন্তা, ধ্যান-ধারণা সেই কালামের মোকাবেলা করতে না পারে। বিনা কারণে কোন নির্দোষ ব্যক্তি শাস্তি পেয়ে যাবে এমন যেন না হয়। সেই পার্থক্যটা কী হবে যাতে মানুষ বুঝতে পারবে, এটা আমার মনের খেয়াল, ইলহাম নয় অথবা ইলহাম, মনের খেয়াল নয় অথবা আমার নিজের বানানো, খোদার নয় অথবা খোদার, আমার নয়? যদি বল একই সময়ে একই সাথে এ খেয়ালও হবে, আমার তরফ থেকে না, আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে; তাহলে এর উত্তর হলো- যখন আমরা মনের খেয়ালকে ইলহাম বলা শুরু করবো তখন মাথায় এই চিন্তা আসতে কোন সময় লাগবে না, এটা আমার খেয়াল নয় বরং ইলহাম। এ ধরনের চিন্তা শুধু ধর্মের প্রতি বিশ্বাসকে বিলুপ্ত করছে না বরং ভ্রান্ত ধারণা ও কু-চিন্তা এবং আল্লাহ্‌র উপর দুঃসাহসিকতাকে এমনভাবে বাড়িয়ে তুলছে, যারা এ ধরনের চিন্তা বা ধারণা রাখে তাদের জন্য ভয় হয় যে, তারা ছোট ছোট ধোকা থেকে এক নতুন ধর্ম না বানিয়ে নেয়। আর সত্য হতে দূরে সরে গিয়ে নিজেও হোঁচট না খায় আর অন্যদেরও হোঁচট না খাওয়ায়।

এতে কোন সন্দেহ নেই, বাক্যালাপের মাধ্যমে ইলহামের ব্যাপারেও কারো কারো অহেতুক সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারে। কেননা ব্রেনের কিছু এমন ত্রুটি রয়েছে যার ফলে মানুষ বিভিন্ন দৃশ্য দেখে ফেলে। অথবা কখনও কখনও শব্দও শুনে থাকে। কিন্তু এতে একটি বিষয় রয়েছে, আর তা হলো ইলহামের এ অবস্থায় ধোঁকায় পড়তে পারে একমাত্র পাগল আর যার ব্রেনে দুর্বলতা রয়েছে। কিন্তু বর্ণিত প্রথম অবস্থায় একটি সামান্য সন্দেহে বিবেকবান ব্যক্তি নিজের চিন্তাধারাকে ইলহাম বলতে পারে, আর তার এই ধোঁকাকে দূর করার জন্য তার কাছে কোন উপায় বা পদ্ধতি অবশিষ্ট থাকে না।

মোটকথা, **মনের চিন্তাভাবনার নাম ইলহাম, এই কু-ধারণা ইলহাম থেকে বঞ্চিত ও দূরে থাকার কারণে হয়েছে। এমন লোকের উপর যদি খোদাতাআলার ইলহাম একটি বারও হতো তাহলে তারা এই ধোঁকায় পড়ত না এবং বুঝে যেত, আল্লাহ্‌তাআলা পূর্ণ প্রতাপ এবং সেই সাথে মধুর আওয়াজে এলহাম করে থাকেন, বান্দা এই ইলহাম ঠিক সেভাবে শুনে যেভাবে দৈনন্দিন কথাবার্তা শুনে। আর কোন ধরনের ধারণা ও সন্দেহের অবকাশ থাকে না।** আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে এই প্রবন্ধের লেখকও এর বাস্তব অভিজ্ঞতা রাখে আর নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি খোদাতাআলার ইলহাম স্বাভাবিক কথপোকথনের মত নাযেল হয় শুধু ধারণার উপর ভিত্তি করে নাযেল হয় না।

এখানে মনে রাখা উচিত, কুরআন করীমের মতে প্রত্যেক ইলহাম, স্বপ্ন অথবা কাশফ খোদাতালার পক্ষ থেকে হয় না। বরং ইলহাম অথবা স্বপ্ন কয়েক ধরনের হয়ে থাকে ইসলাম এ বিষয়কে মানে। কুরআন করীমে আল্লাহ্‌তাআলা বলেন 'ওয়ান নাজমে ইযা হাওয়া, মানজাল্লা সাহেবুকুম ওয়ামা গাওয়া ওয়া মা ইয়ানতেকু আনিল হাওয়া, ইন হুয়া ওয়াহইয়ুন ইউহা আল্লামাহু শাদীদুল কুয়া।' (নজম-১ রুকু) আমরা এই শিকড়

বিহীন চারাকে সাক্ষিরূপে পেশ করছি যখন তা নিপতিত হয় অর্থাৎ, যেভাবে এক চারাগাছ যার শিকড় নেই যদি কিছু উঁচু হয় তখন পড়ে যায়, ঠিক সেভাবেই যে ব্যক্তি নবুওয়তের মিথ্যা দাবীদার হয় সে যতই ইলহাম পাবার দাবীদার হোক, যতই ধোঁকাবাজ হোক, কোন সিলসিলাকে দাঁড় করিয়ে রাখতে যেসব আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রয়োজন, যেহেতু তার শিক্ষার ভিত সেই জ্ঞানের উপর নেই, তাই যখন তার জামাত বাড়তে শুরু করবে তখন সে জামাতে বিলুপ্তির লক্ষণাবলী সৃষ্টি হতে থাকবে, আর উঁচু ও উন্নত হতে পারে না। অর্থাৎ এক স্থায়ী ধর্মের রূপ নেয়ার পূর্বেই ধ্বংস হতে থাকবে আর উচ্চ ও উন্নত হতে পারে না। অর্থাৎ এক স্থায়ী ধর্মের রূপ নেয়ার পূর্বেই ধ্বংস হতে শুরু করে। সেটি অন্যান্য ধর্মের মোকাবেলায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না বরং একটি ফেরকার আকারে হয়ে থাকে। এর মাথা নীচু হয়ে যায়। এরপর (আল্লাহতাআলা বলেন) তোমার সাথী পথভ্রষ্ঠ হয়নি আর না প্রবৃত্তির বশে সে এই দাবী করছে অর্থাৎ- না সে কোন ধোঁকায় পড়েছে, না নিজের উপর কোন এলহাম হয়নি জেনে বুঝে প্রতারণা করে ইলহাম বানাচ্ছে। আর না সে নিজ কামনা বাসনার জন্য কথা বলে অর্থাৎ তার প্রবৃত্তি তার সামনে কিছু দৃশ্য সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে আর সে এটাকে ইলহাম মনে করে বসেছে এমনটি হয়নি, বরং তার প্রতি প্রকৃত ইলহাম হয়েছে। যে ইলহাম অন্য এক প্রতাপশালী সত্তা করেছে কিন্তু এ ধারণা করো না, শয়তানের পক্ষ থেকে ইলহাম হয়েছে। বরং তার ইলহামকারী সেই ক্ষমতাধর খোদা যাঁর হাতে সবকিছু রয়েছে। সুতরাং তিনি স্বীয় শক্তি ও ক্ষমতা প্রকাশের মাধ্যমে প্রমাণ করে দিবেন তার ইলহাম সত্য আর তা খোদার তরফ থেকে হয়েছে। তার জামাত বাড়বে আর বট বৃক্ষের মত উঁচু হবে এবং প্রত্যেক স্বভাবের, শ্রেণীর এবং জ্ঞানের লোক এতে প্রবেশ করবে, যুগের কোন শক্তি এ জামাতকে ধ্বংস করতে পারবে না, সে সংখ্যাগরিষ্ঠ অন্যান্য ধর্মের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে আর সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসাবেই গণ্য হবে।

এই আয়াতে ইলহামের চারটি ধরন বর্ণনা করা হয়েছে।

১. সেই ইলহাম যার উৎস আবিষ্কার করা মানুষের জন্য কষ্টসাধ্য অর্থাৎ যা মানসিক অসুস্থতার ফলে হয়ে থাকে।

২. সেই ইলহাম যা প্রবৃত্তির কামনা বাসনার ফলে হয়। মানুষ যদি চিন্তা করে তাহলে বুঝতে পারে আমার মনে যে চিন্তাধারার উদ্রেক হতো তা-ই আমি বাস্তবে দেখেছি।

৩. সেই ইলহাম যা মূলতঃ শয়তানী হয়ে

যেসব ইলহাম খোদাতাআলার পক্ষ থেকে আসে তা প্রবৃত্তি ও কামনা বাসনা হতে সৃষ্ট ইলহাম হতে ভিন্ন হয়ে থাকে।

থাকে অর্থাৎ যাতে আধ্যাতিকতার বিরুদ্ধে অধর্মীয় ও মন্দ শিক্ষা থাকে।

৪. সেই ইলহাম যা খোদাতাআলার পক্ষ হতে নাযেল হয়।

সুতরাং যখন আমি বলি ইলহামকে ইসলাম খোদাতালার সাথে সাক্ষাতের একটি মাধ্যম হিসাবে আক্ষ্যা দেয় তাহলে আমার বলার উদ্দেশ্য এই নয়, সকল স্বপ্ন ও ইলহাম এমনই। আমি এটি বিশ্বাস করি আর কুরআন করীম আধুনিক গবেষণার বহু পূর্বে স্বপ্নের ব্যাপারে বর্ণনা করে দিয়েছে, এর দু'টি ধরন রয়েছে, একটি সাধারণ অপরটি প্রকৃতিগত।

যেসব ইলহাম খোদাতাআলার পক্ষ থেকে আসে তা প্রবৃত্তি ও কামনা বাসনা হতে সৃষ্ট ইলহাম হতে ভিন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু যাই হোক ইলহামের যেহেতু অন্য ধরনও আছে তাই সাধারণ ইলহামও ইরফান বা তত্ত্বজ্ঞানের জন্য তেমন লাভদায়ক নয়। কেননা কামেল ইরফান বা তত্ত্বজ্ঞানের জন্য মাধ্যমও এমন সত্য ও বাস্তব হওয়া চাই যা নিজ সত্ত্বায় কামেল বা পরিপূর্ণ এবং যার উপর সন্দেহের কোন অবকাশই থাকে না। স্মরণ রাখা উচিত, আমি 'সাধারণ ইলহাম' শব্দটি এজন্য ব্যবহার করেছি কারণ উপরোক্ত সন্দেহ কেবল সাধারণ ইলহামেই হতে পারে। নইলে দোয়ার মত ওহী ও ইলহামেরও এক এমন ধাপ আছে যা তৃতীয় ধরনের তত্ত্বজ্ঞানের সৃষ্টি করে যা তৃতীয় ধরনের তত্ত্বজ্ঞানে আলোচনা করা হবে। সাধারণ ইলহাম দ্বিতীয় ধরনের তত্ত্বজ্ঞান অবশ্য সৃষ্টি করতে পারে অর্থাৎ আইনুল একীন পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে কিন্তু এর চেয়ে উপরে নিয়ে যেতে পারে না।

এই দুই ধরনের জ্ঞান বর্ণনা করার পর এখন আমি তৃতীয় ধরনের জ্ঞানের বর্ণনা করছি। ইসলাম এ ধরনের জ্ঞান অর্থাৎ হাক্কুল একীন সৃষ্টি করারও দাবী করে। আর এতে বড় জোরও দিয়ে থাকে। পাঁচ নামাযেই দিন রাতে ৪০, ৫০ বার খোদাতাআলার কাছে এ দোয়া কর, হে খোদা! তুমি আমাকে সিরাতে মুস্তাকীম দেখাও আর সেই সিরাতে মুস্তাকীম দেখাও যাতে পূর্ববর্তীরা চলেছে, যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছিলে। কুরআন করীমে অপর এক জায়গায় বলেন, পুরস্কৃত লোক দ্বারা সেই লোকদের বুঝায় যাদেরকে আল্লাহ্তাআলা নবুওয়ত, সিদ্দীকিয়ত, শাহাদাত ও সালেহিয়তের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন। (নিসা-রুকু ৯) অর্থাৎ হয় তারা নবী, না হয় নবী হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন। অথবা তারা নবুওয়তের মর্যাদার নিকট তো নন কিন্তু তারা অবশ্যই খোদাতাআলার গুণাবলী হতে কিছু সিফত নিজেদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর এমন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত আছেন যে, তারা আল্লাহ্তাআলার গুণাবলীর বাস্তব প্রভাব লোকদের সামনে উপস্থাপন করতে পারেন। আর নিজেদের অভিজ্ঞতা বলে লোকদেরকে খোদাতাআলার গুণাবলীর দিকে পথনির্দেশ করতে পারেন। অথবা তারা শাহাদাতের মর্যাদার যোগ্যতা সৃষ্টি করেছেন। মর্যাদার এ স্তর বা ধাপ সমূহের মাঝে প্রথম তিনটি স্তরই মূলতঃ সেই মর্যাদার স্তর বা ধাপ যাতে অধিষ্ঠিত হয়ে মানুষ সন্দেহ হতে মুক্ত হয়, পবিত্র হয়। (চলবে)

অনুবাদ -মাওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান

খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী

(ষষ্ঠ কিস্তি)

পবিত্র কুরআনের আল্লাহ্‌তাআলার নির্দেশ–'হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের নিজকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে আগুন থেকে বাঁচাও। (সূরা তাহ্‌রীম ঃ ৭) মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতেন চৌধুরী সাহেব। তাই তিনি নিজে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের শিক্ষানুসারে ধর্মপরায়ণ মানুষ হওয়ার সংস্পর্শে তাঁর উত্তরাধিকারী সন্তানদের জাগতিক শিক্ষার সাথে উত্তম তাকওয়াপরায়ণ মানুষ হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি সন্তানদেরকে আশৈশব থেকে কেমন ধর্মীয় তালীম তরবীয়ত শিক্ষা দেন তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তাঁর সুযোগ্য মেয়ে আমেনা খাতুনের বক্তব্য থেকে। তিনি বলেন, আমরা যখন ঢাকায় ইডেন স্কুলে (তখন ইডেন স্কুল সদরঘাটস্থ পুর্তগীজ কুটি বাড়ীতে অবস্থিত ছিল। ১৮৭৩ সালে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানটিতে ১৯২৬ সালে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী চালু করা হয়। তখন নামকরণ ছিল ইডেন গার্লস হাই স্কুল এন্ড ইন্টারমেডিয়েট কলেজ। ১৯৪৮ সাল থেকে শুধু কলেজ হিসেবে আত্ম প্রকাশ করে। যা আজকের ইডেন মহিলা কলেজ–লেখক) পড়তাম তখন চাদর ব্যবহার করতাম। হিন্দু মেয়েরা দেখে হাসতো ও নানা রূপ উপহাস করতো। এতে একটু লজ্জাবোধ করতাম। বাড়ী এসে কোন কোন দিন বাবাকে এসব কথা বলতাম। তিনি বলতেন মা তোমরা আহমদী সন্তান, অন্য মেয়েদের মত অপরের কথায় লজ্জা করে সত্যকে ত্যাগ করা তোমাদের উচিত নয়। তোমাদের জীবনকে সাধারণ ভাবে গড়লে হবে না। তোমরা এরূপ হবে যাতে তোমাদের আদর্শ দেখে অন্যরা শিক্ষা লাভ করতে পারে। সত্যই তাঁর এ আশীর্বাদ অচিরেই কাজে পরিণত হয়। কিছু দিন পরেই আমাদের আদর্শ দেখে ক'জন মুসলমান বালিকা মাথায় কাপড় ও বোখড়া ব্যবহার করতে থাকে'।

বিশ দশকের শেষ দিকে ও ত্রিশ দশকের প্রথম দিকে চৌধুরী সাহেব যখন কলকাতায় সরকারী চাকুরীতে কর্মরত ছিলেন তখন তিনি তাঁর মেয়েদেরকে মুসলিম নারী শিক্ষার পথিকৃত মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়ার প্রতিষ্ঠিত সাখাওয়াত মেমোরিয়েল গার্লস স্কুলে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেন। ধর্মপরায়ণ নারী মুক্তির অগ্রদূত বেগম রোকেয়া তাঁর এ আহমদী ছাত্রীদেরকে স্কুলে ইসলামীক আকিদায় পর্দা পালন ও নামাযী প্রত্যক্ষ করে অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

আবুল হাশেম খান চৌধুরী

ধার্মীক ছাত্রী আমেনা খাতুন তাদের সেই স্কুল জীবনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন,

আমি ও আমার অন্যান্য বোনেরা যখন কলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলে লেখাপড়া করি তখন স্কুলে আমরা কাদিয়ানী বা আহমদী মেয়ে হিসেবে পরিচিতা ছিলাম। স্কুলের সব মেয়ে ও শিক্ষয়ত্রিরা কোন কোন দিন একত্রিত হয়ে আহমদীয়াত নিয়ে আমাদের সাথে তর্ক করতেন। একদিন ইসলামের পর্দা প্রথা নিয়ে খুব বিতর্ক হয়। আমরা বলি ইসলামে পর্দা পালনের হুকুম আছে। কিন্তু তারা পর্দা ও জামাতে আহমদীয়ার ওপর নানারূপ কুৎসা করতে থাকে। এতে আমরা ব্যথিত হই। কোনরূপ আত্মসংবরণ করে বিষয়টি প্রিন্সিপ্যাল মিসেস আর এস হোসেন (রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, তিনি নিজের নাম আর এস হোসেন লিখতেন–লেখক)–এর নিকট প্রকাশ করি। উত্তরে তিনি হেসে বললেন, 'তোমরাই তর্কে জয়ী হয়েছো! ইসলামের এটাই হুকুম। আমি নিজেও তা পালন করি'। তখন বুঝলাম যথা ধর্ম তথা জয়। আর একদিনের কথা মনে পড়ে। মিসেস আর এস হোসেন স্কুলের সকল ছাত্রীদের একদিন বললেন–'তোমরা ভবিষ্যতে কি হবে ও কেন বিষয়ের ওপর একটি প্রবন্ধ লিখে আনবে'। আমি তখন প্রবন্ধে লিখেছিলাম–'আমি ভবিষ্যতে প্রকৃত ইসলামীক শিক্ষায় শিক্ষিতা হয়ে ইসলামীক আদর্শে নারী শিক্ষা প্রচারকল্পে আত্মোৎসর্গ করতে চাই। কারণ আজকাল যে সব মুসলমান নারী বিদুষী হচ্ছেন, তারা ইসলামের মহান আদর্শ ভুলে গিয়ে ভিন্ন জাতির অন্ধ অনুকরণ করে নিজেকে ধন্য মনে করছেন। তখন তিনি আমার লেখা পড়ে মন্তব্য লিখেন–'মুসলমান বালিকার মনে এরূপ আকাঙ্ক্ষাই হওয়া আমারও উদ্দেশ্য'। তিনি সর্বদা ছাত্রীদের উপদেশ দিতেন, 'মা তোমরা অনেক বড় হও। জগৎ তোমাদের দেখে শিখুক' (পাক্ষিক আহমদী ১৫ মার্চ, ১৯৩৮)।

সে কারণেই বেগম রোকেয়া তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুলে কুরআন শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছিলেন, সাথে ইংরেজী শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। কুরআন শিক্ষা বলতে তিনি শুধু টিয়া পাখীর মত আরবী শব্দ আবৃত্তি করাকে বুঝান নি। এর অন্তর নিহিত অর্থ অনুধাবণ করাকেও বুঝিয়েছেন। তিনি ব্রিটিশ সরকারকে কুরআন শিক্ষা বাধ্যতামূলক আইন পাশের পরামর্শ দেন। নারী শিক্ষার উদ্দেশ্যে দৃঢ়চিত্তে শিক্ষাব্রতী রোকেয়া বলেন, মেয়েদের এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে যাতে তারা ভবিষ্যত জীবনে আদর্শ গৃহিনী, আদর্শ জ্ঞানী এবং আদর্শ নারীরূপে পরিগণিত হতে পারে। (রোকেয়া রচনাবলী, পৃঃ-৬৭)। ফলে বেগম রোকেয়ার নিজ হাতে গড়া আবুল হাশেম সাহেবের মেয়েরা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ধর্মীয় ও জাগতিক উভয় শিক্ষা লাভে উত্তম আদর্শে মানুষ হন। সমাজে শিক্ষিতা জ্ঞানবান আদর্শ নারী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। প্রকৃতপক্ষে চৌধুরী সাহেব চাকুরী জীবনের বিভিন্ন স্থানের উত্তম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আদর্শবান শিক্ষক শিক্ষিকার নিকট নিজ ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষা দিয়েছেন।

বলাবাহুল্য, আবুল হাশেম ও বেগম রোকেয়া উভয় শিক্ষানুরাগী প্রধানতঃ এ দেশের মুসলমান সমাজে শিক্ষার আলো জ্বেলে দেয়ার কাজে ব্রত ছিলেন। সামাজিক প্রতিকুল পরিবেশে বিরাজমান কু-প্রথা, কুসংস্কারে পুঞ্জীভুত আবর্জনা সমূলে উৎপাটনে নবচেতনায় নিরলস কাজ করেছেন। বিদুষী রোকেয়া মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষার জ্যোতির প্রভাবে নারীমনে সচেতনতা ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় সচেষ্ট ছিলেন। আর আবুল হাশেম বিভাগীয় স্কুল পরিদর্শক হিসেবে বিভিন্ন শিক্ষালয়ে শিক্ষার মানন্নোয়নে বিভিন্ন দিক নির্দেশনার সাথে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানে সহায়তা করেন। তাঁরা উভয়েই সমাজে শিক্ষা উন্নয়নে একাধিক গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। সে সুবাদেই বেগম রোকেয়ার সাথে আবুল হাশেমের পরিচিতি ছিল। তিনি এ মহীয়সী নারীকে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের সুসংবাদও জানান। তবলীগী বই-পত্র দেন। কিন্তু তাঁর মাঝে ধর্মীয় অনুরাগ থাকলেও আল্লাহ্‌তাআলার হেদায়াত লাভের সৌভাগ্য হয়নি। এ ক্ষণজন্মা মহিলা ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর বায়ান্ন বছর বয়সে মারা যান।

আবুল হাশেম সাহেব সন্তানদেরকে শুধু যে বঙ্গদেশে শিক্ষা দিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন তা নহে। পুণ্যভূমি কাদিয়ানের মাটি ও আলো-বাতাসে যুগ ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) এবং জামাতের বিশিষ্ট বুযুর্গ সাহাবী ও আলেমদের সান্নিধ্যে তাঁদের দোয়া ও স্নেহস্পর্শে শিক্ষা লাভে উত্তম তাকওয়াপরায়ণ মানুষ হওয়ার উদ্দেশ্যে ১৯৩৬ সালের ৬ ডিসেম্বর পরিবার পরিজনকে কাদিয়ান নিয়ে যান। তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা ছিল সন্তানরা কাদিয়ানের কষ্টি পাথরে উত্তম মানুষ হোক। তাই ছেলেমেয়েদেরকে তিনি জামাতের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত শিক্ষালয়ে ভর্তি করে দেন। (অবশ্য ছেলে আবুল কাশেম খান চৌধুরী আনসার এর পূর্ব থেকেই কাদিয়ানে অধ্যয়নরত ছিলেন)। তখন তাঁর পরিবার পরিজন মাওলানা আব্দুর মুগনী খান নাজের তবলীগের বাড়ীতে বসবাস করতেন। বাড়ী ভাড়া ছিল মাসিক দশ টাকা। ১৯৩৭ সালে ঐশী নেতা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) এক জুমুআর খুতবায় জামাতের উদ্দেশ্যে তাহরীক করেন, 'বন্ধুগণ কাদিয়ানে বাড়ী নির্মাণ করতে চেষ্টা করুন' (মাসিক আহমদী জুলাই ১৯৩৭)। কাদিয়ানের দোয়া এবং মাটি ও মানুষের পাগল আবুল হাশেম সাহেব এ তাহরীক শুনেই লাব্বায়েক বলেন। তিনি সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের প্রেক্ষিতে গ্র্যাচুয়েটির অর্থ বাবদ প্রাপ্ত সাইত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়ে আধুনিক শৈল্পিক নিদর্শনের বৃহৎ অট্টালিকার সুরম্য সৌধ একটি বাড়ী কাদিয়ানে নির্মাণ করেন। এবং পরিবার পরিজনকে স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করেন। এ বাড়ীটি তিনি তাঁর শ্রদ্ধাভাজন দাদার নামানুসারে রাখেন 'ফজলুর রহমান মঞ্জিল'। তাঁর স্মৃতি বিজরিত এ বাড়ীটি আজও কাদিয়ানের মাটিতে বিদ্যমান আছে। তবে তার পরিবার কাদিয়ানে বসবাস করলেও তখন তিনি বঙ্গীয় আমীরের দায়িত্ব পালনে অধিকাংশ সময় বঙ্গদেশে অবস্থান করতেন।

কাদিয়ানে বসবাস কালে তাঁর সন্তানরা কেমন ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেছিলেন তার বর্ণনায় মেয়ে আমেনা খাতুন বলেন, 'আজ এক বছর কাদিয়ানে এসে খোদার ফযলে নিজ জীবনে একটি পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। যদিও আদর্শ হতে এখনও বহু দূরে। পূর্বে আমরা শুধু কুরআন তেলাওয়াত করতাম। কোন দিন এর অর্থ বা তাৎপর্য বুঝতে চেষ্টা করিনি। এখন স্কুলে, হযরত সাহেবের দরসে এবং জুমুআর নামাযে প্রত্যহ কুরআনের তফসীর ও অর্থ শুনে থাকি। এতে ইসলামে আদর্শ নারী জীবনের কর্তব্য ও ইসলামে নারীর অধিকার ইত্যাদি জরুরী বিষয় অবগত হচ্ছি। এখানকার মহিলাদের জীবনযাত্রা প্রণালী দেখলে অতীতের সেই মহীয়সী নারীদের পুণ্যময় জীবন কাহিনী স্মরণ হয়। সুকুমারমতি বালক বালিকার কোমল চিত্তে যে ভাবটি একবার অঙ্কিত হয়ে যায় সারা জীবনেও তা মুছতে পারা যায় না। শিশুচিত্ত অনুকরণ প্রিয়। তাই তাদের জন্য মাতার দায়িত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক। জন্মের পর হতে প্রতি দিন প্রতি মুহূর্তে মাতাই তার সাথী। মা যা করেন ও বলেন শিশু তাই শিখে। মাতাই তার একমাত্র শিক্ষয়িত্রী। কাদিয়ানের মহিলারা তাদের এই দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করছেন। তাঁরা তাদের প্রথম প্রধান কর্তব্য মনে করেন সন্তানকে ইসলামীক বিষয় শিক্ষা দেওয়া। ফলে এখানকার সাত বছরের কচি খোকাও জানে ইসলাম কি এবং কেন সে মুসলমান ও আহমদী হয়েছে।' (পাক্ষিক আহমদী, ১৫ মার্চ, ১৯৩৮)।

মানবতার এক আদর্শবান মানুষ ছিলেন চৌধুরী সাহেব। মানুষের দুঃখ-কষ্টে সহমর্মীতায় অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে পড়তেন তিনি। তাই মানব সেবা তাঁর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। ১৯১৫ সালের জানুয়ারী মাসে কাদিয়ানে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর হাতে বয়াত গ্রহণের পর একদিন তীব্র শীতের প্রভাতে বন্ধুবর মৌলভী মোবারক আলী সাহেবকে সাথে নিয়ে বেড়াতে ছিলেন। তখন কাবুল থেকে হিজরতকারী মৌলভী গোলাম রসূল নামে জামাতের একজন বিশিষ্ট আলেমকে হাড় কাঁপানো শীতে শুধু মাত্র একটি পাতলা সূতির জামা পড়া অবস্থায় কষ্ট করতে দেখে চৌধুরী সাহেব নিজের পরিহিত পশমী মোটা কোটটি তাঁকে দান করে দেন। হযরত ওমর (রাঃ) সময় এক যুদ্ধে আহত সাহাবীরা মৃত্যুর যন্ত্রণায় ছটফট করা অবস্থায় তাদের পিপাসা মিটানোর জন্য পানি নিয়ে গেলে তাঁরা নিজে পান না করে একে অপরের সহমর্মিতায় আহত ভাইকে দানে ইচ্ছা ব্যক্ত করে যে উৎকৃষ্ট আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আবুল হাশেম সাহেব সেই দিন সে আদর্শের অনুপ্রেরণায় নিজের সুখ বিসর্জনে অপর ভাইয়ের সুখের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তিনি উচ্চ বংশের উচ্চ শিক্ষিত বড় সরকারী কর্মকর্তা এবং সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মাঝে কোন অহংকার, হিংসা বিদ্বেষ ও গরীবের প্রতি ঘৃণা ছিল না। বঙ্গদেশের গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে থাকা আহমদী সাধারণ মানুষদের প্রতি তার প্রবল ভ্রাতৃত্বপূর্ণ মমতাবোধ ছিল। তিনি মাইলের পর মাইল পায়ে হেটে দূর দূরান্তে জামাত সফর করেছেন। গ্রামের অশিক্ষিত সাধারণ কৃষক পরিবারের মানুষের পার্শ্বে দাঁড়িয়েছেন। মোখালেফাত সৃষ্টি হলে তা নিরাময়ে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা করেন। সকলকে অভয় বাণী শুনাতেন। বিভিন্ন জামাতে অনুষ্ঠিত জলসা কিংবা অন্য কোন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে সকলের সাথে প্রাণে প্রাণে মিশে গেছেন তিনি। বঙ্গীয় আমীর ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হিসেবে তাঁর জন্য পৃথক থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হলে তা তিনি বারন করতেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) মেহমানদের সাথে একাকার হয়ে যাওয়াই তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। জানা যায় তারুয়া আহমদীয়া জামাতের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জলসায় তিনি সকলের সাথে বাড়ীর উঠানে লাইনে বসে মাটির সানকিতে আহার করেছিলেন। এতেই তিনি তৃপ্ত হন।

জীবনের শেষ দিকে তিনি এক বার একটি প্রাইভেট কার ক্রয়ের জন্য এক গাড়ী বিক্রেতা এজেন্সীর সাথে চুক্তি করেন। সেকালে পাকভারতে গাড়ী তৈরীর কোন কোম্পানী ছিল না। এজেন্সীর সাথে বায়না করলে তারা বিদেশ থেকে গাড়ী আমদানী করে সরবরাহ করতো। তখন একদা তিনি কাদিয়ানে মসজিদে নামায পড়তে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় একটি গাড়ীর কাঁদা পানির ছিটাতে তাঁর জামা নোংড়া হয়ে যায়। মানব দরদী আবুল হাশেম সাহেব তখন অনুভব করেন, হায়রে! আমিও তো গাড়ী ক্রয় করতে যাচ্ছি। আমার গাড়ীর দ্বারাও তো কোন মুসল্লীর জামা এমনিভাবে কাঁদা পানিতে নষ্ট হতে পারে। তাই তিনি গাড়ী ক্রয়ের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে সেই অর্থ কাদিয়ানে মসজিদ নির্মাণে দান করে দেন। এমন সূক্ষ্ম মানবতাবাদী এবং আর্থিক কুরবানী দাতা মানুষ ছিলেন চৌধুরী সাহেব। তাঁর মাঝে পার্থিব কোন চাওয়া পাওয়ার বাসনা ছিল না বলেই তিনি আহমদী জামাতে দীক্ষা গ্রহণের পর নাটোরের জমিদারের মোতুওয়াল্লীর কাজ ছেড়ে দেন। *(চলবে)*

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

মুলাকাৎ

বাঙ্গালী বন্ধুদের সাথে হুযূর (রাহেঃ)-এর ১৬-১০-২০০১ তারিখের সাক্ষাৎকার

(এম.টি.এ-এর মাধ্যমে সরাসরি প্রচারিত)

প্রশ্ন নং ১ঃ হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর একটা ইল্হাম আছে "যারা তোমার ঘরের মধ্যে রয়েছে তাদের কোন ক্ষতি হবে না", আমার প্রশ্ন হচ্ছে, হুযূর আল্লাহ্তাআলার ঐ প্রতিশ্রুতি কি সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য?

হুযূর (রাহেঃ) বলেন, প্লেগের (Plague) ক্ষেত্রে আল্লাহ্ থেকে প্রাপ্ত এ প্রতিশ্রুতি অন্যন্য ক্ষেত্রেও অকশ্যই নিদর্শনমূলকভাবে পূর্ণ হয়েছে। আল্লাহ্ বলেছিলেন, **ইন্নী উহাফিযু কুল্লামান ফিদ্দার** প্লেগের যুগে তো এটা এক অসাধারণ নিদর্শন ছিলই এবং এত বেশি লোক আহমদী হয়েছিল যে, অন্য কোন সময় তা হয় নি। হুযূর বলেন, আরবী শব্দ "দার" অর্থ গৃহ কিন্তু এটার ব্যাপক অর্থ হচ্ছে জামাত অর্থাৎ যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে মান্য করবেন তাদের সবাইকে আল্লাহ্ বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নিজেই ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন, "দার" মানে কাদিয়ান নয় যারা আমার আধ্যাত্মিক সন্তান তারা সবাই আমার "গৃহবাসী"। অবশ্যই যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মান্যকারী হবে আল্লাহ্তাআলা তাদেরকে নিদর্শন হিসেবে বিপদের সময় রক্ষা করবেন।।

প্রশ্ন নং-২ ঃ কুরআন মজীদের সুরাতলু লুকমান, আয়াত নং ১১ তে বলা হয়েছে ঃ খালাকাস্ সামাওয়াতি বিগায়রি আমাদিন্ তারাওনাহা ওয়া আলক্বা ফীল আরযিও রওয়াসিয়া আন তামীদাবিকুম ওয়া বাস্সা ফীহা মিন কুল্লি দাববাহ্.....

এখানে যা বলা হয়েছে বর্তমান যুগের ভূতত্ত্ববিদরা কি তার সাথে একমত?

হুযূর বলেন, 'আন তামীদাবিকুম' এর অর্থ এই নয় যে, পাহাড়-পর্বত ভূমিকম্প রোধ করে; এর সঠিক অর্থ হচ্ছে, এরা খাদ্য উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আধুনিক ভূতত্ত্ববিদ্যা বলে, ভূমিকম্পের ফলেই পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে, তাই এ দাবী করা বোকামী হবে যে পাহাড়-পর্বত ভূমিকম্প রোধ করে। হুযূর বলেন, আমি কুরআন মজীদ অনুবাদ করার সময় এই ভুল ধারণা আগেই সংসশোধন করে দিয়েছিলাম। হুযূর বলেন, যদি কুরআনের বাংলা অনুবাদে এ ভুল অর্থ করা হয়ে থাকে তাহলে সেটা সত্বর সংশোধন করা উচিত।

প্রশ্ন নং-৩ ঃ হুযূর আজকাল প্রায়ই খবর আসে যে (Sucide bomber) অর্থাৎ আত্মঘাতী বোমারু যেমন প্যালেষ্টাইনের লোকেরা নিজ শরীরে বোমা বেঁধে শত্রুদের প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দেয়। এ বিষয়ে কিছু বলবেন কি?

হুযূর বলেন, আত্মহত্যা কুরআন শরীফে নিষিদ্ধ। আল্লাহ্তাআলা মানুষকে জীবন দেয়েছেন তাই কেউ নিজে আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন কেড়ে নেয়ার অধিকার রাখে না। আল্লাহ্

যখন চাইবেন, যে ভাবে চাইবেন জীবন নিয়ে নিবেন। আত্মঘাতি বোমারুরা দুই দিক থেকে ভুল করছে ঃ

(১) পবিত্র কুরআনের মহান শিক্ষাকে লংঘন করছে।

(২)তারা যখনই ইসরাঈলীদের কোন ক্ষতি করতে সক্ষম হয় তখন ইসরাঈলীরা দশগুণ প্রতিশোধ নিতে গিয়ে প্যালেস্টাইনবাসীদের উপর হামলা করাচ্ছে। এটা কান্ডজ্ঞানহীন কাজ। একাজে মোটেই সমর্থন করা যায় না।

প্রশ্ন নং- ৪ ঃ হুযূর কুরআন শরীফে আছে শয়তান আল্লহ্তআলার কাছ থেকে কিছু সময় চেয়েছিল **ফানজুর ইলা ইয়াওমি ইউবআসুন** যেন তাকে তার অপকর্মের জন্য সংগে সংগে শাস্তি দেয়া না হয়। আল্লাহ্ তাকে **ইলা ইয়াওমিল ওয়াকতিল মা'লুম** সময়ও দিয়েছিলেন। এই বিষয়ে কিছু বলুন।

হুযূর বলেন, আল্লাহ্তাআলা শয়তানকে হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর আগমনের পূর্ব-পর্যন্ত সময় দিয়েছিলেন। তাই সে তখন যা ইচ্ছে তাই করতে পারতো। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর আবির্ভাবের পরে রূপক অর্থে কিয়ামতের যুগ আরম্ভ হয়েছে এবং শয়তান শিকলাবদ্ধ হয়েছে। মহানবী (সঃ) বলেছেন, রমযান মাস যখন শুরু হয় তখন শয়তানদের শিকলাবদ্ধ করা হয়। সকল লোকের জন্য শয়তানকে শিকলাবদ্ধ করা হয় না, কেবল তাদের জন্য করা হয় যারা নিজেদের কামনা-বাসনা, চিন্তা-চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করেন। হুযূর (রাহেঃ) বলেন, এর এই অর্থই রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর একটি হাদীসে আছে, দুনিয়া মু'মিনদের জন্য কারাগার এবং কাফিরদের জন্য জান্নাতস্বরূপ। অর্থাৎ মু'মিন আল্লাহ্র খাতিরে দুনিয়াতে অনেক বিধি নিষেধ মেনে চলে। আল্লাহ্ মু'মিনদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। শয়তানকে দূরে রেখেছেন। অতএব **ইলা ইয়াওমিল ওয়াকতিল মা'লুম** অর্থ হ'ল মহানবী (সঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে শয়তানের স্বাধীনতা ছিল কিন্তু মহানবী (সঃ)-এর আবির্ভাবের পর শয়তানকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। রসূলে করীম (সঃ)-এর আর একটি হাদীস থেকেও একথা প্রমাণিত হয়। প্রত্যেক মানুষের রক্তে শয়তান চলাচল করছে। সে মানুষকে পথভ্রষ্ট করছে। রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাহাবারা ইহা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, "হে রসূল (সঃ) আপনার রক্তে কি শয়তান চলাচল করে"? মহানবী (সঃ) উত্তর দিলেন, হাঁ আমার রক্তেও শয়তান আছে কিন্তু সে মুসলমান হয়ে গেছে। অর্থাৎ সেই শয়তান তার (সঃ) কোন ক্ষতি করতে পারে না কারণ, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) নিজেকে পুরোপুরি আল্লাহ্র নিকট সমর্পণ করেছিলেন।

প্রশ্ন নং ৫ ঃ হুযূর পবিত্র কুরআনে এক জায়গায় আছে আল্লাহ্তাআলা খবীরুম বিমা ইয়াফআলুন আর এক জায়গায় এসেছে খবীরুম বীমা ইয়া'মালূন। আমার প্রশ্ন এ দুই বাক্যের অর্থ কী? কোন তফাৎ আছে কি?

হুযূর বলেন, 'ইয়াফআলূন' এর অর্থ যা জেনে শুনে বা না জেনে করা হয় আর 'ইয়া'মালূন অর্থ যে সব কাজ শুধু জেনে-শুনে করা হয়।

[টীকা ঃ এ পর্যায়ে এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক হুযূরকে সম্বোধন করে বলেন। আস্সালামু আলাইকুম হুযূর, আমি আজকে বয়াত করেছি। আপনি আমার জন্য দোয়া করবেন। হুযূর খুশী হন এবং তাকে জিজ্ঞেস করেন দেশে আপনার পরিবারের লোকেরা কি জানে যে, আপনি আহমদী হয়েছেন? তিনি উত্তর দেন, তার পরিবার এখনও এ খবর পায় নি। এ কথা শুনে হুযূর তাকে পরামর্শ দেন আপনি বাংলাদেশের "ন্যাশনাল আমীর" সাহেবকে অনুরোধ করুন, তিনি যেন আপনার পরিবারের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন ও তাদেরকে মানসিকভাবে এ বয়াত এর সংবাদের জন্য প্রস্তুত করেন। এতে ভাল ফল আশা করা যায়।]

প্রশ্ন নং ৬ ঃ হুযূর সূরা আর রহমানের আয়াত নং ৪৭-এ বলা হয়েছে **ওয়া লিমান খাফা মাকামা জান্নাতান** এ দু'টি জান্নাত দ্বারা আসলে কী বুঝানো হয়েছে?

হুযূর বলেন, আয়াত নং ৪৭ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যারা আল্লাহ্কে ভয় করে পবিত্র জীবন যাপন করবে তাদের জন্য এ পৃথিবীর জীবন জান্নাতের মত হবে এবং মৃত্যুর পরে তারা আর একটি জান্নাতে প্রবেশ করবে। আয়াত নং ৬৩ দ্বারা বুঝানো হয়েছে সাধারণ মু'মিনদের জন্য তো ওপরে উল্লেখিত দু'টি জান্নাত আছেই কিন্তু যারা উঁচু পর্যায়ের মু'মিন যেমন সাধক আল্লাহ্র প্রিয় নবী-রসূল, তাদের জন্য সাধারণ মু'মিনগণের দু'টি জান্নাত ছাড়াও আর ও দু'টি উঁচু মার্গের জান্নাত আছে।

প্রশ্ন নং ৭ ঃ হুযূর সিজদা কত দীর্ঘ হওয়া উচিত?

হুযূর বলেন, মহানবী (সঃ) তো মাঝে মাঝে অর্ধেক রাত সিজদায় পড়ে থাকতেন, অর্থাৎ দোয়া করতেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এক হাদীসে বর্ণনা দিয়েছেন হযরত রসূলে করীম (সঃ) যেভাবে সিজদা করতেন তার সাথে অন্য কারও সিজদার তুলনাই হয় না। রসূলে করীম (সঃ)-এর সিজদা খুবই আধ্যাত্মিক স্বাদপূর্ণ হ'ত। তিনি সব সময় একা আল্লাহ্তাআলার দরবারে দোয়া করতে চাইতেন। একবার রাতের অন্ধকারে হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁকে (সঃ) বিছানায় পেলেন না তখন তাঁর মনে এ চিন্তা আসল যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) হয়তো তাঁর অন্য কোন স্ত্রীর কাছে গেছেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সন্ধানে বাইরে যান তখন তিনি দেখতে পান যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এক অন্ধকার জায়গায় সিজদায় পড়ে আছেন আর আল্লাহ্র নিকট কেঁদে দোয়া করছেন।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলেন। প্রায় এক ঘন্টার পর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) সিজদা থেকে নিজের মাথা উঠালেন। হুযূর বলেন সিজদা দীর্ঘ হওয়া ব্যক্তি বিশেষের উপর নির্ভর করে। অনেক লোকের সিজদা সংক্ষিপ্ত হয় আবার অনেকের সিজদা দীর্ঘ হয়। অনেকে জানেই না তার সিজদাতে আল্লাহ্র কাছে কী চাইবে, কী দোয়া করবে।

প্রশ্ন নং ৮ ঃ হুযূর হাদীসের সবচে বড় বই বুখারী শরীফের প্রথম অধ্যায়ে বলা আছে ওহী কিভাবে শুরু হ'ল। সেখানে প্রথম হাদীসটি হচ্ছে **"ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিয়্যতে"** আমি জানতে চাই এ হাদীসের সাথে ওহী আসার কী সম্পর্ক আছে?

হুযূর বলেন, এ প্রশ্ন আগেও করা হয়েছিল। **"ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়্যতে"** এর অর্থ হচ্ছে মহানবী কোন কথা বানিয়ে বলেন নি অর্থাৎ কোন ওহী মহানবীর নিজের মনগড়া কথা ছিল না। রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিয়্যত পবিত্র ছিল। তিনি সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্র ওপর নির্ভর করতেন। তাঁর সব ওহী খাঁটি ছিল।

প্রশ্ন নং ৯ ঃ হুযূর আজকাল বাংলাদেশ "তত্ত্বাবধায়ক সরকার" দ্বারা শাসিত হচ্ছে। এটা কি ইসলাম সম্মত ব্যবস্থা?

হুযূর বলেন, ইসলামের সাথে এর কোন সম্পর্ক খোঁজার দরকার নেই। এটা একটা সাময়িক ব্যবস্থা যেটা সে দেশের রাজনীতিবিদরা ভাল মনে করেছেন। আজকের পৃথিবীতে কোন দেশে কি খাঁটি ইসলামী সরকার আছে?

এই সাক্ষাৎকারের শেষের দিকে দুই বাঙ্গালী ভাই তারেক এবং যুবায়ের দ্বৈত কণ্ঠে একটি উর্দু নযম গেয়ে শুনান-

ওয়াক্ত কম হ্যা মালগাজী হো রাহি
শাম চলো...../

সংকলন ও অনুবাদ

মরহুম আলহাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী

কাদিয়ান সফর ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

মনে খুব আশা ছিল যে একবার যদি নিজ নয়নে খলীফাতুল মসীহ্‌কে দেখতে পারতাম! খলীফাতুল মসীহ্‌কে দেখার প্রবল আশা প্রত্যেকটি আহমদী সদস্যেরই রয়েছে । তাই মনে মনে ভাবি আর দোয়া করতে থাকি কিভাবে সম্ভব প্রিয় খলীফার দর্শন লাভ। ইতিমধ্যে অনেকের কাছে জানতে পারলাম কাদিয়ানের ১৪৪তম সালানা জলসায় নাকি হুযূর (আইঃ) আসতে পারেন। এই খবর হালকা শুনা মাত্রই দোয়া করতে শুরু করলাম খোদা যেন আমাকে কাদিয়ান যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। তার পর হঠাৎ পাক্ষিক আহমদীতে দেখতে পেলাম যারা কাদিয়ান যেতে চান তারা যেন অতিসত্তর ছবি, পাসপোর্ট নাম্বার ইত্যাদি ন্যাশনাল আমীর সাহেব-এর নিকট পাঠায়। ভাবলাম এখনো জলসা আসতে ৫/৬ মাস বাকী আর এত আগেই এসব চাওয়া হচ্ছে, অবশ্যই তাহলে এই জলসায় হুযূর আসছেন। তাই তাড়াতাড়ি করে যা যা দেওয়ার তা পাঠিয়ে দিলাম। আস্তে আস্তে জলসার সময় ঘনিয়ে আসতে লাগলো আর সবার মুখেই শুনা যাচ্ছে হুযূর (আইঃ)-এবার আসছেন। মনে খুব আনন্দ লাগছে প্রিয় ইমামকে কাছ থেকে দেখতে পারব। সময় গড়াতে গড়াতে হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) মরিশাস সফর শেষ করে ১১/১২/০৫ইং কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। প্রথমে দিল্লী মসজিদে কয়েক দিন অবস্থান করেন তার পর যুগ ইমাম হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর প্রিয় গ্রাম দারুল আমান কাদিয়ানে পৌঁছেন। যখন হুযূর (আইঃ) কাদিয়ানে পৌঁছে গেলেন তখনও আমাদের কারও ভিসা হয় নি। সবাই চিন্তি ত ভিসা হচ্ছে না। যারা বাংলাদেশ থেকে যাচ্ছে তাদের অধিকাংশের ই.জ.এ.ঈ বাসে ঢাকা-কলকাতা পর্যন্ত এবং কলকাতা থেকে অমৃতশহর পর্যন্ত টিকেট বুক করে রাখা। এদিকে ভিসা হচ্ছে না, সময় কমতে লাগলো, সবাই খুব চিন্তিত ও দোয়ায় রত। ইতিমধ্যে শুনতে পারলাম যারা ৫/৬ মাস পূর্বে পাসপোর্ট নাম্বার ইত্যাদি জমা দিয়েছে তাদের ৯০ জনের ভিসা হয়ে যাবে। এই কথা শুনে কিছুটা ভাল লাগলো, তখন খুব ইচ্ছে করছে এই ৯০ জনের ভিতরে আমার নামটা আছে কিনা, দেখতে পেলাম আছে। এটা দেখে খুব আনন্দ পেলাম। আর দোয়াও করতে লাগলাম যাদের ভিসার সমস্যা হচ্ছে তাদেরটাও যেন হয়ে যায়। দেখা গেল কিছুটা ঝামেলা হওয়া সত্ত্বেও জামাতী ব্যবস্থাপনায় প্রায় সবারই ভিসা হয়ে যায়। ১৯/১২/০৫ইং সকাল ৭.৩০ ভোরে কমলাপুর B.R.T.C বাসষ্টান্ডে পৌঁছি। গিয়ে দেখি দুটো বাসের সকল যাত্রীই আহমদী। এই দৃশ্য দেখে খুব আনন্দ লাগলো মনে। বাস ছাড়ার পূর্বে দোয়া করলেন মিশনারী ইনচার্জ মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান সাহেব এর নির্দেশে মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক সাহেব। এ ছাড়াও আমাদের সাথে ছিলেন ন্যাশনাল নায়েব আমীর-৩। বাস তার নিজ গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এক সময় সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসলো আমরাও কলকাতা পৌঁছলাম। সবাই কলকাতা আহমদীয়া মসজিদে উঠলাম। হাত মুখ ধুয়ে নামায আদায় করলাম ও খাবার খেয়ে বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়লাম। ২১/১২/০৫ ইং সকাল ৭.৪৫ মিঃ হাওড়া ষ্টেশন–অমৃতশহর যাওয়ার টিকেট বুক করে রেখেছিলেন মাওলানা বশিরুর রহমান সাহেব। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে তা করেছেন, দোয়া করি আল্লাহ্‌তাআলা তাঁকে এর প্রতিদান দিন। ২১ তারিখ ভোরে, আমরা ট্রেন ষ্টেশনে পৌঁছলাম। ট্রেনের যাত্রা শুরু হল অমৃতশহরের (কাদিয়ানের) উদ্দেশ্যে। ট্রেনে ইতিমধ্যে ঝাড়কান্দ-এর কিছু আহমদী ভাইয়ের সাথে পরিচয় হয়ে যায় তাদের সাথে গল্প করতে করতে সময় বেশ ভাল কাটতে লাগলো। এছাড়া আমাদের বাংলাদেশ থেকে যারা এই ট্রেনে যাচ্ছেন তারাও সবাই সবার খোঁজ খবর নিচ্ছেন এবং কারও কোন অসুবিধা আছে কিনা।এটাও ছিল দেখার মত। যার যার সিটে ঠিকমত বসলো কিনা এটা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন মাওলানা সোলায়মান সাহেব। সারা দিন কেটে গেল ট্রেনেই। ট্রেনেই সবাই নামায আদায় করলো। রাত ঘনিয়ে আসলো আর শীতের আভাসও লাগতে লাগলো। ট্রেনেই রাত ভালভাবে কেটে গেল ।সকাল হল, ওযু করে ফজর নামায আদায় করে নাস্তা করলাম। ট্রেনতো চলছেই ঝিক ঝিক শব্দ করে তার নিজ গতিতে। ট্রেন থেকে রাস্তার দুপাশের প্রাকৃতির দৃশ্যগুলো দেখতে খুব ভালই লাগছে। সন্ধ্যা ৭টার দিকে ট্রেন পৌঁছলো অমৃতশহরে। ষ্টেশনে সব বাংলাদেশীরা এক সাথে বাসের জন্য বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। রাত ১০টার দিকে তিনটি বাস রিজার্ভ করা হল যা দিয়ে সবাই কাদিয়ান পৌঁছবো। নায়েব ন্যাশনাল আমীর ৩ সাহেব এর নেতৃত্বে সবাই এক এক করে বাসে উঠি। রাত প্রায় ১১.৩০ মিঃ এর দিকে বাস গিয়ে পৌঁছে কাদিয়ান এর গেষ্ট হাউজে। সবাই বাস থেকে নেমে রেজিষ্ট্রি করে নেই। দেশে অনেকেই বলেছিল বেশি করে গরম

কাপড় নিয়ে যেতে কারণ এবার নাকি বাঙ্গালীদেরকে তাবুতে থাকতে হবে। তাই সবাই বেশি করে গরম কাপড়ও সাথে নিয়েছিল। কিন্তু খোদাতাআলার ফযলে বাঙ্গালীদের থাকার ব্যবস্থা করা হয় গেষ্ট হাউজেই। এক একজনকে দুইটি করে লেফ দেয়। কারও যেন কোনরূপ অসুবিধা না হয় তার জন্য ও খাদেম রাখা ছিল। আমাদের সবার এক সাথেই থাকার ব্যবস্থা হলো।

খাবারের ব্যবস্থাও ছিল ভাল। জলসা শুরু হওয়ার পূর্বে কাদিয়ানের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো দেখি আর সময় হলেই ওয়াক্তের নামায পড়ার জন্য মসজিদে চলে যেতাম সবাই। হুযূর (আইঃ)-এর পিছনে নামায পড়তে পেরে সবাই নিজেকে ধন্য মনে করি। নামায শুরু হওয়ার ২ ঘন্টা পূর্বে গিয়ে মসজিদে ১ম তো দূরের কথা ২য় কাতারেও দাঁড়ানো যায় না। সবাই এত আগেই লাইনে বসে থাকে। মানুষের ঈমানী জোস কতটুকু আছে তা প্রমাণ পাওয়া যায় নামাযের মাধ্যমে। নামাযে দোয়া করি প্রিয় ইমামের সাথে যেন সাক্ষাৎ করতে পারি। এলান দেওয়া হল যারা হুযূর (আইঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করবেন তারা যেন আগামী কাল ২৪/১২/২০০৫ ইং সকাল ৯টা থেকে মসজিদ আকসাতে এসে উপস্থিত হোন। আমরা খুব ভোরেই মসজিদ-আকসাতে পৌছলাম এবং লাইন ধরে বসলাম। হুযূর (আইঃ) আসলেন সবার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য। এরই মধ্যে লাইনে হাজার হাজার মানুষের সমাগম দেখা গেল। হুযূর (আইঃ) এক এক করে সবার সাথে হাত মিলাচ্ছে হৃদয়ে ভয় সৃষ্টি হতে লাগলো যে আমার মত এই অধম যুগ ইমামের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছে কত বড় সৌভাগ্য। মনে দুরূদ ও ইস্তেগফার করতে লাগলাম আর সামনে এগুতে লাগলাম। হুযূর (আইঃ)-কে যখন সালাম জানালাম তিনি (আইঃ) উত্তরে জিজ্ঞেস করলেন কোন জায়গা থেকে এসেছি, আমি বললাম বাংলাদেশ। হুযূর (আইঃ) আমার হাতে ধরে বললেন খুব ঠান্ডা লাগছে? তারপর হুযূর (আইঃ)-কে সালাম জানিয়ে ও দোয়া চেয়ে বিদায় নেই। সাক্ষাৎ শেষে মনে মনে খুব খারাপও লাগছে যে হুযূর (আইঃ)-এর হাত ধরলাম আর চুমু খেলাম না। তাই খুব দুঃখ হচ্ছে। দোয়া করতে লাগলাম, খোদা যেন আবার সাক্ষাত করার সুযোগ মিলিয়ে দেয়। প্রতি ওয়াক্তের নামায তো হুযূর (আইঃ)-এর পিছনেই পড়া হচ্ছে এটাও জীবনের বড় একটা পাওয়া। ২৬ ইং তারিখ জলসা শুরু হবে। তাই ভোরেই রওনা দিলাম জলসাগাহে। সবার আশা সামনে বসে খুব কাছ থেকে হুযূর (আইঃ)-কে দেখবে। তাই আমিও এই সুযোগটি নিলাম। সকাল ১০টার দিকে হুযূর (আইঃ)-জলসাগাহে আসলেন। প্রথমেই হুযূর (আইঃ) আহমদীয়া জামাতের পতাকা উত্তোলন করলেন, তারপর দোয়া করালেন। দোয়া শেষে ১১৪তম সালানা জলসার কার্যক্রম শুরু করেন প্রথমে কুরআন পাঠের মাধ্যমে, তারপর উর্দ্দু নযম পাঠ করা হয়। এর পর হুযূর (আইঃ) উদ্বোধনী বক্তৃতা প্রদান করেন যা পৃথিবীতে সরাসরি LIVE দেখানো হয় M.T.A এর মাধ্যমে। জলসার দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় ২-৩০ মিঃ এর দিকে। মাগরীব এশা নামায জমা পড়ান হুযূর (আইঃ) জলসাগাহে। ২৭ ডিসেম্বর হুযূর (আইঃ) লাজনাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করেন এবং যারা বিভিন্ন পড়াশুনায় ভাল রেজাল্ট করেছে তাদের পুরস্কার দেন।

২৮ ডিসেম্বর হুযূর (আইঃ) সমাপনী বক্তৃতা দিবার পূর্বে পাকিস্তান থেকে আসা বিভিন্ন বিষয়ে উত্তম ফলাফলকারী ছাত্রদেরকে পুরস্কার প্রদান করেন। কুরআন ও নযম পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সমাপনী ও উদ্বোধনী বক্তৃতা প্রদান করেন এবং দোয়া করেন। দোয়া শেষে হুযূর (আইঃ) ভারত থেকে আসা নওমোবাইনদের সাথে সাক্ষাত করেন। জলসাগাহে মাগরীব এশা নামায জমা হয়। তারপর হুযূর (আইঃ) নিজে বিয়ের এলান করেন এবং দোয়া করেন। ২৯ তারিখ আমরা প্রায় ৫০জন মাওলানা বশীরুর রহমান সাহেবের নেতৃত্বে হুশিয়ারপুরে যাই। যেখানে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) চিল্লা কাশি করেছিলেন এবং হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর শুভসংবাদ খোদাতাআলা তাকে জানিয়েছিলেন সেই স্থানে আমরা সবাই নামায আদায় করি ও দোয়া করি। সেখান থেকে আসার পথে একটি কমলা বাগান চোখে পড়ে। আমরা সবাই এই বাগানে যাই এবং খুব আনন্দ লাগে এই বাগান দেখে। সাথে সাথে ছবিও তুলে নিলাম। হুশিয়ারপুর যাওয়ার ব্যাপারে তিনজন খুব কষ্ট করেছেন তারা হলেন নুরুদ্দিন আহমদ, জাফর আহমদ ও মাওলানা বশীরুর রহমান সাহেব।

জানতে পারলাম হুযূর (আইঃ)-এর সাথে বাংলাদেশের মুবাশ্বের মুরব্বী ও মোয়াল্লেম সাহেবদের সাথে একটি সাক্ষাতের সুযোগ হতে পারে। এই কথা শুনে খুব ভাল লাগলো আর মনে মনে ভাবতে লাগলাম যে এবার হুযূর (আইঃ) হাতে চুমু খাব অবশ্যই। তাই হুযূর (আইঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য সকাল থেকে মসজিদ আকসাতে অপেক্ষা করতে লাগলাম। সকালে সাক্ষাত হল না, তাই দুপুরে খাবার খেয়ে আবার গেলাম, দেখতে পেলাম বাইরে লিষ্ট ঝুলানো যারা যারা আজ দেখা করবে। প্রায় ২শত জন পরিবারের নাম রয়েছে এতে আমাদের নাম নেই তারপরও দাঁড়িয়ে রইলাম। এক

এক করে সবার শেষ হল তারপর হঠাৎ করে আমাদের ডাক আসলো। আমরা ভয়ে ভয়ে গেলাম না জানি হুযূর (আইঃ) কি জিজ্ঞেস করেন। আমাদের মধ্যে ছিল মুবাশ্বের মুরব্বী শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমিন, মোহাম্মদ সোলায়মান, রইস আহমদ, শরীফ আহমদ, মোয়াল্লেম ছিলাম, খাকসার, মাহমুদ আহমদ শরীফ ও ইদ্রিস আহমদ। আমরা প্রথমেই হুযূর (আইঃ)-কে সালাম জানালাম। হুযূর উত্তর দিলেন। আমরা সবাই হুযূর (আইঃ)-এর হাত ধরে চুম্বন খেলাম, ছবি উঠালাম। তারপর হুযূর (আইঃ) আমাদের সবাইকে একটি করে কলম প্রদান করলেন যাতে লেখা রয়েছে মির্যা মাসরূর আহমদ। বাংলাদেশ জামাতের পক্ষ থেকে শাহ মুহাম্মদ নূরুল আমিন সাহেব হুযূর (আইঃ) কে পাক্ষিক আহমদীর একটি পেকেট উপহার দেন। সেখানে একটি হাসির ঘটনা ঘটে তা হল মাহমুদ আহমদ শরীফ যখন বললো যে হুযূর (আইঃ) আমার তিন ছেলে মেয়ে ওয়াকফে নও তাদের জন্য দোয়া করবেন তখন হুযূর (আইঃ) খুশী হয়ে তাকে আরও তিনটি কলম দিলেন আর বললেন আপনাদেরও যদি তিনটি ওয়াকফে নও সন্তান থাকতো তা হলে আপনারাও তিনটি করে কলম পেতেন। তারপর আবার সবাই সালাম ও দোয়া চেয়ে হুযূর (আইঃ)-এর কাছ থেকে বিদায় নেই। মনের আশা পূরণ হল, হুযূর (আইঃ)-এর হাতে চুম্বন খাওয়ার। ভাবতে অবাক লাগে যে ৪/৫ ঘন্টা এক স্থানে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার মানুষের সাথে এক এক করে সাক্ষাত করছেন যুগ খলীফা। বাহ্যিক কোন নেতা নয় বলেই ক্লান্তি ছাড়া হাজার হাজার মানুষের সাথে সালাম বিনিময় করে যাচ্ছে। এবারের জলসার বিশেষ একটি দিক হল এত হাজার হাজার লোক সমাগম হওয়া সত্ত্বেও থাকা খাওয়ার কারও কোনরূপ কষ্ট হয় নাই। সবাইকে থাকার জন্য গরম কাপড় দেওয়া হয়। যারা বিভিন্ন দায়িত্বে ছিল তাদের ব্যবহার ছিল অমায়িক। যখন যা দরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করে তা এনে দিতে। কখনও কোন খোদ্দাম বা দায়িত্বরত যিনি আছেন তারা বিরক্তির কোন আচরণ করেছেন বলে জানা যায় না। এবারের জলসায় ৭০ হাজার লোক সমাগম হয়। এর মধ্যে ১০/১২ হাজার বাহিরের দেশ থেকে এসেছে বাকী সব ভারত বর্ষের। আমাদের দেশ থেকে প্রায় চারশত ব্যক্তি উক্ত জলসায় অংশগ্রহণ করেন। জলসার বক্তব্য সবাই যেন তার নিজ ভাষায় শুনতে পারেন তার জন্য অনুবাদের ব্যবস্থা ছিল। বেশ কয়েকটি ভাষায় অনুবাদ হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১। ইংরেজী, ২। বাংলা ৩। তামিল ৪। তেলেগো ৫। মালে ৬। আরবি ৭। ফ্রান্স ইত্যাদি। দেখতে দেখতে আমাদের সময় শেষ হতে লাগলো, খুব খারাপ লাগছে পবিত্র ভূমি ছেড়ে চলে যেতে হবে বলে। যেদিন আমরা কাদিয়ান থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিব সেদিন সকালে হুযূর (আইঃ) গেষ্ট হাউসের দিকে আসেন, তখন আবার প্রিয় খলীফাকে শেষ বারের মত খুব কাছ থেকে দেখি। আসার কিছুক্ষণ পূর্বে বেহেশ্‌তি মাগবেরায়, মসজিদ মোবারক ও হুযরায় দোয়া করি। দোয়া করি খোদা যেন আবার এই পবিত্র স্থানগুলোতে বার বার আসার তৌফীক দান করেন। আমরা দুপুর ২টার দিকে ২টি বাস রিজার্ভ করে কাদিয়ান থেকে অমৃতশহরে আসি। অমৃতশহর থেকে ট্রেন ছাড়ে সন্ধ্যা ৬-৪৫ মিঃ। সবাই যার যার আসনে বসলেন, গাড়ি চলছে খুব দ্রুত। ইতিমধ্যে মাগরীব এশা নামায জমা পড়লাম। রাতের খাবার হালকা কিছু খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোর হল, হাত মুখ ধুয়ে ফযর নামায পড়লাম, তারপর কয়েকজন মিলে নাস্তা করলাম। ট্রেনের ভিতরে কয়েকজন মিলে মুড়ি খাওয়ার পালা। মুড়ি খাওয়ার জন্য নায়েব আমীর ৩ সাহেব ও এসে যোগ দিলেন। মুড়ি খাওয়ার আড্ডা এত জমেছিল যা দেখার মত দৃশ্য ছিল। এরই মধ্যে জনাব পানাউল্লাহ্ সাহেব একটি বাংলা নযম শুনালেন খুব মনমুগ্ধ সুরে। আনন্দ করতে করতে দিন কেটে গেল, আবার রাত ঘনিয়ে আসলো, রাত ও কেটে গেল। অবশেষে আমরা পৌছে গেলাম শিয়ালদা ষ্টেশনে। সবাই গিয়ে উঠি কলকাতা মসজিদে। ৫/০১/০৬ ইং সকালে কলকাতা থেকে B.R.T.C বাসে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিব তাই ভোরে উঠে প্রথমে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করলাম তারপর ফযর নামায পরে B.R.T.C বাস ষ্টেশনে পৌছলাম। সকাল ৮টায় গাড়ি ছাড়লো ঢাকার উদ্দেশ্যে। ২টি বাসে প্রায় সবাই আহমদী যাত্রী। গাড়ি যখন ইন্ডিয়া ইমিগ্রেশন ও চেক পোষ্টে এসে গেল সবাই গাড়ী থেকে নামলাম। সবার ব্যাগ চেক করবে। ইতিমধ্যে মিশনারী ইনচার্জ মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব গাড়ি থেকে নেমে অফিসারকে বললেন এই দুই গাড়িতে প্রায় সবাই আহমদী। আমরা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পাঞ্জাবের কাদিয়ানে গিয়েছিলাম। এই যাত্রীরা যে কোন অবৈধ মালামাল আনে নাই তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। মাওলানা সাহেব এর কথা বলায় খুব সহজেই আমরা ইন্ডিয়া ও বাংলাদেশের কাষ্টম পার হয়ে যাই আমাদের ২/ ৩ ঘন্টা সময় বেছে যায়। রাত ৮.৩০ টার দিকে এসে পৌছি ঢাকায়। কাদিয়ান সফরের স্মৃতি এখনও মনে ভেসে উঠে আর অনেক কিছু স্বপ্নের মত মনে হয়।

–মাহমুদ আহমদ সুমন

আত্মত্যাগের মাঝেই অপরিসীম কল্যাণ

আমরা যদি নবী করীম (সঃ) এর পূর্ববর্তী আম্বিয়া (আঃ) ও তাঁদের শিষ্যদের জীবনের দিকে তাকাই তাহলে দেখি তারা সব সময় অবিশ্বাসীদের কাছে নিগৃহীত হয়েছেন। তাদের মান সম্ভ্রম খোদাতাআলার জন্য উৎসর্গ করতে হয়েছে। জীবন্ত মানুষগুলোর মাথার ওপর এখনো করাতের দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে এবং চিন্তা করলে আমাদের হৃদয় শিউরে উঠে। আর আমাদের অন্তরের অন্তরস্থল থেকে ঐ সকল নিগৃহীত মানুষদের জন্য দরদের শ্রোত বইতে থাকে। তাদের দোষ কি ছিল? তাদের দোষ ছিল খোদাতাআলার তৌহীদ এবং মানবের মাঝে ভালবাসা প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু শত্রু অবলোকন করেছে। খোদাতাআলার প্রিয় বান্দাদের রং কি? মোট কথা বলতে গেলে তাদের রং ছিল, খোদার রঙ্গে রঙ্গীন হওয়া আর শত্রুদের সামনে দৃঢ়তার সহিত একথা বলে দেওয়া তোমরা যদি আমাকে এক হাতে সূর্য আর এক হাতে চাঁদও এনে দাও তাহলেও খোদার অর্পিত দায়িত্ব পালনে বিমুখ হওয়া কখনো সম্ভব নয়।

যদি খোদাতাআলার প্রেরিত ব্যক্তিরা মানব জাতির হেদায়াতের জন্য পৃথিবীতে আগমন এবং জীবন উৎসর্গ না করতেন তাহলে এ দুনিয়া অভিশপ্ত নরকের ন্যায় হতো। অপরদিকে তাঁর (আল্লাহ্) সত্তার সম্বন্ধে আজ আমাদের হৃদয় অজ্ঞ রয়ে যেত। যেহেতু এই দুনিয়ার জন্য খোদাতাআলার তরফ থেকে মানবের জন্য মোযেযা প্রদর্শন আবশ্যক ছিল সেহেতু ঐ নিগৃহীত মনুষগুলোকে তার তৌহীদ প্রতিষ্ঠা এবং প্রত্যেক মানবকে পশুরস্তর থেকে নৈতিকতার স্তর পর্যন্ত পৌছানোর জন্য মোযেযা স্বরূপ বেছে নিয়েছিলেন।

এতএব, গভীরভাবে এই বিষয়ে মনোনিবেশ করা বর্তমানে একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। তারা একেক জন একেক যুগের জন্য ছিল মোযেযাস্বরূপ ও ঐশী বিকাশের একমাত্র মাধ্যম। আর এই ঐশী বিকাশের যোগ্যতা অর্জন তাদের নিঝুম রাত্রের দোয়া ও অশ্রু বিসর্জনের ফলশ্রুতিতেই ছিল।

এখন আমরা সর্দারে আলম খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) এর পবিত্র জীবনের প্রতি দৃষ্টি দিব। কেননা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্তাআলা বলেন, তোমরা যদি খোদার রঙ্গে রঙ্গিন হতে চাও, তাহলে তোমরা সর্ব প্রথমে মুহাম্মদের রঙ্গে নঙ্গীন হও। তবেই তোমাদেরকে ভালবাসবেন। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩২)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্তালা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে বলেন, তোমাকে আমার ক্বাওসার দান করেছি। অতএব তুমি তোমার প্রতি পালকের উদ্দেশ্যে নামায পড় এবং কুরবানী কর, (সূরা আল ক্বাওসার আয়াত ২/৩)। ক্বাওসার মানে হচ্ছে প্রাচুর্য, এমন প্রাচুর্য যা পেলে মানুষ আত্মতৃপ্তি লাভ করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্তাআলা বলেন, যারা ঈমান আনে এবং যাদের হৃদয় আল্লাহ্র প্রশান্তি লাভ করে। স্মরণ রাখিও! আল্লাহ্র স্মরণেই হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ করে, ফলে আর কোন মানুষের চাহিদা থাকে না। প্রাচুর্যের প্রতিশব্দ আরবীতে আরেকটি শব্দ হল তাকাছুর। তাকাছুর শব্দের অর্থও প্রাচর্য যা পেলে মানুষের চাহিদা আরও বেড়ে যায়। আমাদের নবী করীম (সঃ) এমন প্রাচুর্যের অধিকারী হয়েছেন যা পবিত্র কুরআনে এভাবে বর্ণনা করেছেন, "আমরা তোমাকে ক্বাওসার দান করেছি, (সূরা ক্বাওসার) অপরদিকে কাফেরদেরকে এমন প্রাচুর্য দান করা হয়েছে পবিত্র কুরআনে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে" আল হাক্বু মুত্তাকাছুর" অর্থাৎ আধিক্য লাভের পরস্পর প্রতিযোগিতা তোমাদিগকে (আল্লাহ্ হতে) উদাসীন করে দেয়। "হাত্তা ঝুরতুমুল মাক্বাবীর" অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা কবরে পৌছ (সূরা আত তাকাছুর আয়াত ঃ ২/৩)।

আমাদের নবী করীম (সঃ)-এর আত্মত্যাগের বিষয়টি যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে দেখতে পাই রসূলে করীম (সঃ) এর কাছে যখন মালে গণিমত আসত তিনি তা সাহাবাদের মাঝে বিতরণ করে দিতেন। অথচ গণিমতের মাল রসূল করীম (সঃ) এর জন্য হালাল ছিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন একদিন সকাল বেলা গনিমতের মাল স্তুপীকৃত ছিল, আর তিনি সাহাবাদের মাঝে সমস্ত মাল বিতরণ করে দিলেন। নিজের জন্য তিনি কিছুই রাখেন নি। হযরত আয়েশা (রাঃ) আরও বর্ণনা করেন সেদিন রাত্রের বেলা আমাদের ঘরে কোন খাবার ছিল না, শেষ পর্যন্ত আমরা রাতের বেলা দুটি খেজুর এবং দু'গ্লাস পানি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। অতএব, রসূলে করীম (সঃ) এর আত্মত্যাগের মূল উদ্দেশ্য ছিল তার প্রাণ আল্লাহ্র পথে উৎসর্গের মাধ্যমে তাকে অন্বেষণ করা।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন, যখন মানুষ শুধু সত্যের সন্ধানে অক্লান্ত ধৈর্যের সাথে আল্লহ্র পথে চেষ্টা ও সাধনা করে তখন আল্লাহ্ স্বীয় ফযল ও কৃপার মাধ্যমে নিজ প্রতিভা অনুযায়ী তার হেদায়াতের দার উন্মুক্ত করে দেন, (মলফূযাত ১ম খন্ড)। রসূলে করীম (সঃ) আল্লাহ্তাআলাকে লাভ করার জন্য যে সাধনা নির্ধারণ করেছিলেন তা ছিল হুকুকুল্লাহ্ ও হুকুকুল ইবাদ অর্থাৎ খোদাতাআলার তৌহীদ প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা। নিজে না খেয়ে তিনি গরীবদের মাঝে যে আপন ধন বিতরণের অপূর্ব দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা মানব ইতিহাসে এক মহান অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে কিয়ামতকাল পর্যন্ত স্থান লাভ করতে থাকবে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) জামাতকে নসীহত করতে গিয়ে বলেন, 'আমি দুটি বিজয় নিয়ে এসেছি পথমতঃ খোদাতাআলার তৌহিদকে এখতিয়ার কর দ্বিতীয়তঃ আপোষে পরস্পর ভালবাসা এবং সহমর্মিতা প্রকাশ কর। ঐ ধরনের দৃষ্টান্ত স্থাপন কর যেন অন্যদের জন্য কেরামত স্বরূপ হয়। এটাই সেই দলিল যা সাহাবাদের মাঝে পয়দা হয়েছিল। পবিত্র কুরআনে

আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, "তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে অতঃপর আল্লাহ্‌তাআলা তোমাদের হৃদয়গুলিকে একত্র করে দিলেন, (সূরা আলে ইমরান আয়াত ১০৪)।

মসীহ মাওউদ (আঃ) আরও বলেন, স্মরণ রেখেও হৃদয়ের মিলন এ একটি মোযেযা, মনে রেখো যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের মাঝে প্রত্যেক ব্যক্তি এরূপ না হয় যে, সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত এরূপ না হয় সে আমার জামাতভুক্ত নয়, (আলহাকাম)।

হযরত রসূলে করীম (সঃ) প্রত্যেকটি সৃষ্টি জীবের জন্যই তাঁর প্রগাঢ় ভালবাসার এক অনুপম আদর্শ এবং নিজের স্বার্থ নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ বিসর্জন দিতে সক্ষম হন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তাআলা এরশাদ করেন অর্থাৎ নিশ্চয় সে (নিজের প্রতি) যুলুমকারী (এবং নিজের পরিণাম সম্বন্ধে) বেপরোয়া, (সূরা আহযাব আয়াত ঃ ৭৩) সুতরাং রসূলে করীম (সঃ) তাঁর সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টির খাতিরে ত্যাগ তিতিক্ষা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করলেন। অবশেষে তিনি মানবকে খোদার সান্নিধ্যে পৌঁছানোর জন্য ঐশী বিধান অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের বাণী পৌঁছানোর দায়িত্বভার নিজের কাঁধে নিলেন। এটা তাঁর জীবনে এক কঠিন বোঝা ছিল যা অন্যান্য জীব বা বস্তু, ফিরিশ্‌তা, আকাশমালা, পৃথিবী এবং পর্বতমালা এই দায়িত্বের বোঝা বহনে অক্ষম হওয়ার কারণে অস্বীকার করলেন। কেননা তিনি নিজের প্রতি যুলুমকারী ও নিজের দায়িত্ব পালনে চিন্তিত এবং এত যত্নবান ছিলেন যে আল্লাহ্‌তাআলার মাঝে নিজেকে এমনভাবে বিলিন করে দিয়েছেন যেন তারই নিজ সীমানায় প্রতিচ্ছবি হয়ে গেলেন। অপরদিকে তিনি মানবের কাছে প্রেমপূর্ণ হৃদয়াবেগ ও সহানুভূতির পূর্ণ মঙ্গল আকাঙ্খায় কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে মানবের কাছে এমনভাবে অবতীর্ণ হয়েছিলেন যা সৃষ্টিকর্তা ও মানবতা এই দুই ধনুকের সংযোগ রশ্মিতে পরিণত হলেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, এবং (তিনি বাণী প্রেরণ করলেন তখন) যখন সে সর্বোচ্চ দিগন্তের উপর ছিল। অতঃপর সে (আল্লাহ্‌র) নিকটবর্তী হল, তখন তিনিও [মুহাম্মদ (সঃ) এর প্রতি] নিচে নামলেন। অতঃপর সেই দুই ধনুকের এক তন্ত্রী হয়ে গেলেন অথবা উহা হতেও নিকটতর হয়ে গেল।" (সূরা নাজম আয়াত-৮,৯,১০)

অতএব, আঁ হযরত (সঃ) এর আত্মত্যাগ আমাদেরকে এই কথা স্মরণ করে দেয় ঃ হে উম্মতে মুহাম্মদীয়া! যদি খোদা এবং খোদার রসূলের প্রতি ভালবাসা রাখ তাহলে ব্যক্তি ও জাতির প্রয়োজনে আমরা যেন আত্মত্যাগ করি নিজের আপন ধন মানুষের কল্যাণে যেন বিলিয়ে দেই তবেই আমরা পৃথিবীর সব মানুষকে এক খোদা এবং এক নেতা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর পতাকাতলে একত্র করতে সক্ষম হব।

তাছাড়া আমরা যদি হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর সাহাবাদের কুরবানীর কথা চিন্তা করি তাহলে দেখতে পাই এ কুরবানী সাহাবাদের কুরবানী নয়। এই কুরবানী প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর কুরবানী ছিল। হযরত মুহাম্মদ আরবী (সঃ) কে সমগ্র মানব জাতির জন্য হেদায়াত দানকারী সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষকরূপে প্রেরণ করেছেন। তিনি এমন এক জাতিতে প্রেরিত হয়েছিলেন যারা তৎকালীন সময়ে সব চাইতে বর্বর জাতি হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল। হযরত রসূলে করীম (সঃ) তাঁর আত্মত্যাগের মাধ্যমে বর্বর অধঃপতিত জাতিকে এমনভাবে তরবিয়ত করলেন যে, তারা দুনিয়ার জন্য সুসভ্য জাতি ও খোদাতাআলার প্রিয় বান্দায় পরিণত হয়ে ধর্মীয় জগতের আকাশে নক্ষত্ররূপে সূচিত হলেন। যার আলোয় সারা জাহান উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল।

আঁ হযরত (সঃ) সাহাবাদের সম্পর্কে বলেন, আমার সাহাবাগণ নক্ষত্রস্বরূপ তাদের মধ্যে যাকেই অন্বেষণ করবে হেদায়াত পাবে। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসুদ (রাঃ) সম্বন্ধে বর্ণিত যে, তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে খানা কাবাতে গিয়ে উচ্চ স্বরে কুরআন তেলাওয়াত শুরু করে দিলেন। এ দৃশ্য দেখে কাফেরগণ প্রচন্ডভাবে তাঁকে আক্রমণ করে। তাদের মারধরে তিনি রক্তাক্ত হয়ে পড়েন। এই অবস্থাতেই কাফেরগণ তাঁকে উত্তপ্ত মরুভূমিতে শুইয়ে পাথর মারতে থাকে। তিনি ধৈর্য ধরে হাসতে থাকেন। একজন জিজ্ঞাসা করল তুমি হাসছ কেন? তিনি বললেন, এক ব্যক্তি যখন বাজার হতে কোন পাত্র ক্রয় করে তখন সে উহাকে ভালভাবে বাজিয়ে দেখে শুনে ক্রয় করে, আমি এ জন্য হাসছি যে, আমার খোদা আমাকে কিনছেন। এই সত্য কথা ও নির্ভীকতা দেখে তাৎক্ষণিকভাবে সতের (১৭) জন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। (তাবাকাতে ইবনে সাআদ, তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ১১৭)।

হযরত তালহা (রাঃ) সম্বন্ধে বর্ণিত উহুদের যুদ্ধে রসূলে করীম (সঃ) এর চতুপার্শ্বে সাহাবাগণ নগন্য সংখ্যায় রয়ে গেলেন। হযরত তালহা (রাঃ) একাই প্রিয় নবীর হেফাযতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং শত্রুর তীর প্রতিহত করতে লাগলেন। শত্রুর তীর তিনি নিজ হাতে প্রতিহত করেন। এমনকি একহাত আহত হয়ে অবশ হয়ে পড়ল তিনি অপর হাত বাড়িয়ে দেন। পরবর্তীতে যখন জিজ্ঞাস করলেন হযরত তালহা (রাঃ) কে, তোমার হাত আহত হলে তুমি কি ব্যাথা অনুভব করনি? হযরত তালহা (রাঃ) বললেন, আমার হাত আহত হওয়ার পরও ব্যাথায় স্থান পরিবর্তন করেনি। এর কারণ আমার সামনে হযরত নবী করীম (সঃ) এর জীবন সবচেয়ে প্রিয় ছিল। (বুখারী কিতুবুস শুরুত)

অতএব, রসূলে করীম (সঃ) কীভাবে অধপতিত জাতিকে তরবিয়ত করে সোনার টুকরাতে পরিণত করেছিলেন। এটা কি রসূলে করীম (সঃ)-এর আত্মত্যাগ নয়?

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন, আরবের মরুভূমিতে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। লক্ষ লক্ষ মৃত ব্যক্তি অল্প কিছু দিনের মধ্যে জীবিত হয়ে গেল। অতীতের বিকৃত মানুষগুলি খোদার রঙ্গে রঙ্গিন হয়ে গেল। অন্ধরা চক্ষুষ্মান হল। মুকদের কণ্ঠে খোদার তত্ত্বজ্ঞান জারী হল। পৃথিবীতে একবারই এরূপ বিপ্লব ঘটল যে, পূর্বে না কেউ এটা দেখেছে, না কেউ শুনেছে। তোমরা কি জান, এটা কি ছিল? এটা একজন "ফানাফিল্লাহ্" (যিনি আল্লাহ্‌তে

বিলীন হয়েছেন) এর অন্ধকার গভীর রাত্রির দোয়াই তো ছিল। তিনি পৃথিবীতে এ আলোড়ন সৃষ্টি করে দিলেন এবং ঐ অদ্ভুদ ঘটনা ঘটিয়ে দেখালেন। যা এই নিরক্ষর অসহায় ব্যক্তির পক্ষে এক অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল। (রূহানী খাযায়েন-খন্ড,১০ পৃঃ)

মোট কথা এই যে, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বর বা দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বর (আঃ)দের ওপর নির্যাতন ও উৎপীড়ন এমনই নিদারুন ছিল যে, উহার দৃষ্টান্ত ধর্মের ইতিহাসে কোথাও অন্যের বেলা দেখা যায় না। বিশেষ করে হযরত মুহাম্মদ আরবী (সঃ)-এর এ আত্মত্যাগের ফলে মানব জাতি খোদাকে লাভ করার পরিপূর্ণ শক্তি অর্জন করেছে। আর অন্য দিকে মুহাম্মদ (সঃ) এমন কল্যাণের অধিকারী হয়ে গেলেন কিয়ামত এবং কিয়ামতের পরও মানব জাতি স্বাক্ষ্য দিবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা ও রসূল। অর্থাৎ যেখানে খোদার নাম উচ্চারণ করবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু সেখানে আল্লাহ্র নামের সাথে এ কথাও বলতে হবে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ কেননা এই স্বীকারোক্তির মাঝেই মানব জাতির মুক্তি নিহিত। সুতরাং এই জন্যই হযরত মুহাম্মদ আরবী (সঃ) খাতামান্নাবীঈন। খাতামান্নাবীঈন পদমর্যাদা তাকেই দেওয়া হয় যার অনুগত্য করলে নবী , সিদ্দিক, শহীদ, সালেহ পদ মর্যাদা লাভ করা যায়। 'হে বন্ধুগণ! গভীরভাবে আমাদের চিন্তা করা উচিত মুহাম্মদ আরবী (সঃ) এর আত্মত্যাগের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল? তাঁর উদ্দেশ্য তাঁরই অনুসারী হয়ে কতটুকু আমরা বাস্তবায়ণ করতে পেরেছি। আমরা কি পৃথিবী থেকে ত্রিত্ববাদীতা ও নাস্তীকতা সমূলে উৎপাটন করতে পেরেছি? কিন্তু হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) এর আত্মত্যাগের একমাত্র মূল উদ্দেশ্যই তো ছিল। হে মানবজাতি তোমরা একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত কর আর একে অপরের ভাই ভাই হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তোমরা সকলে মিলে তৌহিদের গান গাও। সে জন্য আমাদের উচিত পৃথিবীতে একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা এবং নিজেদের জীবনে একত্ববাদের রং ধারন করা এবং নিজেদের মাঝে ভালবাসা প্রতিষ্ঠা করে ইসলামের সুন্দর শিক্ষাকে সমুজ্জল রাখা। কিন্তু উম্মতে মুহাম্মদীয়ার অবস্থান আজ কোথায় বিশ্বের মান চিত্রে মুসলমান জাতি আজ সন্ত্রাস নামে পরিচিত। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) এর আত্মত্যাগের মূল উদ্দেশ্য কি এটাই ছিল? নাউযুবিল্লাহ। আজকে যারা দাবী করছেন আমরা খাঁটি ইসলামের অনুসারী তারা আজ ইসলামী ব্যানার সামনে রেখে যে দৃশ্য অবতারণা করছেন ইসলামের সাথে বিন্দু মাত্র সম্পর্ক নেই। ইতিহাস কখনো তাদেরকে ক্ষমা করবে না। আমরা ইতিহাস অধ্যায়ন করেছি, যুলুম নির্যাতন যতই শক্তিশালী হোক না কেন এটা কখনো ন্যায়ে পরিণত হয় নি। মিথ্যা মিথ্যাই আর সত্যকে যতই গোপন রাখার চেষ্টা করুক না কেন সত্য একদিন না একদিন প্রতিফলিত হবে এবং হয়েছেও। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এবং সর্বশক্তিমান খোদার ওয়াদা যে তিনি এই নশ্বর দুনিয়া থেকে অসহায় মানুষদের উপর নির্যাতন সমূলে উৎপাটন করে তার শক্তি প্রতিষ্ঠা করবেই।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্তাআলা বলেন, আমি এবং আমার রসূলগণ অবশ্যই বিজয় লাভ করব, (সূরা মুজাদেলা-২২)।

হে অজ্ঞ আলেম এবং জনগোষ্ঠি আর কত দিন আবু জাহলের ভাগ্য থেকে অংশ নিবে। তোমাদের জন্ম কি এই জন্যই হয়েছিল। স্মরণ রেখো ইসলাম কখনো তলোয়ার দিয়ে কায়েম হয় নি। বরং বহু রক্তের বিনিময় এবং সত্যতা, বিশ্বস্ততা, প্রেম-প্রীতি, আন্তরিক ভালবাসার মাধ্যমে ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই শিকড় বহু গভীরে পৌঁছে গেছে এটাকে উপরে ফেলা এবং নিমিশেই ধ্বংস করা সহজ কাজ নয়, এর শিখা উন্নততর ও উচ্চতর হতে থাকবে, বিস্তার লাভ করবে এবং পৃথিবীর সকল মানবের অন্তরকে জয় করে হযরত মুহাম্মদ আরবী (সঃ) এর আত্মত্যাগের মহিমায় উদ্বুদ্ধ করে মানব জাতিকে ইসলামের সেবায় আত্মৎসর্গ করবে। এখন ইসলাম এই পৃথিবীতে নাস্তিকতা, ত্রিত্ববাদীতা এবং বস্তুবাদিতার প্রভাব থেকে মানব জাতিকে মুক্ত করবে। ইসলাম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ কলেমার ছায়াতলে একত্রিত করার জন্য আজ ইসলামের নিজস্ব শক্তি নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে নিযামে খিলাফতের মাধ্যমে সুসংগঠিত হয়েছে। ইতিপূর্বে ইসলামের শিকড়কে যারাই উপড়ে ফেলতে চেয়েছিল তারা পরাজয় বরণ করে এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে। সুতরাং সেদিন আর বেশি দূরে নয় যেভাবে পারশ্য থেকে রুম পর্যন্ত ইসলাম বিস্তার করে দুনিয়াকে এক মোযেযা প্রদর্শন করে দেখিয়েছে। তেমনিভাবে ইসলাম আজ সারা দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে আর এক শক্তিশালী মোযেযা প্রদর্শন করবে। সেজন্য আমাদের এখন থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া উচিত। এবং এই মহা পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে হলে সর্বদা আত্মত্যাগের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে।

হযরম মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) বলেন, "যখন তোমরা সত্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে যখন তোমরা নামাযসমূহে নিষ্ঠা অর্জন করবে, যখন তোমরা জামাতের সেবার জন্য দিন রাত্রে নিবিষ্ট থাকবে তখন জেনে নিও যে, এখন তোমাদের পদক্ষেপ এমন এক মর্যাদায় উপনীত হলো যারপর কোন পথভ্রষ্টতা নাই। অনুরূপভাবে তোমাদের উচিত তাহরীকে জাদীদ বিষয়ে বিগত খুতবাগুলি সকলকে অবহিত করা এবং তাদেরকে বল যে, তারা যেন অন্যদেরকে জানায়। যদি তোমরা এইরূপ কাজ কর তাহলে পৃথিবীতে কেউ তোমাদের নাম জানুক বা না জানুক প্রকৃতপক্ষে এই পৃথিবীর জীবনের মূল্যই বা কি? কয়েক বছরের জীবন তার পর শেষ। কিন্তু খোদা তোমাদের নাম জানবেন। আর যার নাম খোদা জানেন তার চেয়ে অধিক কল্যাণ ও সৌভাগ্য আর কিছুই হতে পারে না। (খুতবা জুমুআ ১লা এপ্রিল ১৯৩৮)

আল্লাহ্তাআলা আমাদের সকলকে উপরোক্ত বিষয়গুলোর ওপর আমল করার তৌফীক দান করুন, আমীন।

–হাসেম উল্লাহ্ সিকদার

ঈদের সাথে ঈদ

"আজ ঈদ। মদীনার ঘরে ঘরে আনন্দ। বাতাসে আতর গোলাপের সুবাস।" "মহানবীর দয়া"–নামে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এরকমভাবে শুরু হওয়া একটি গল্প পড়েছিলাম, সত্যই পড়ার খাতিরে পড়া বা অন্যভাবে নিলে পাশ করার জন্য পড়া (আমি বরাবরই ছাত্র হিসাবে গা-ছাড়া মনোভাবের) সেই গল্পটি ১৮/১৯ বছর পর আমার জীবনে এমনভাবে পূর্ণ হবে তা আমি জীবনে কোনদিনই ভাবতে পারিনি। জামানার সবচেয়ে মহান ব্যক্তিত্বের সাথে সবচেয়ে অধম পাপী এমনভাবে মিলবে–বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারের মত কূল ছাপিয়ে আছড়ে পড়বে বালিয়াড়িতে–এ কথা আমি কল্পনাতেও ভাবতে পারিনি কোনদিন। তবুও সে মাহেন্দ্রক্ষণ এল আমার জীবনে। সব অপূর্ণতাকে "সাত্তারী" পর্দায় আবৃত করে মহান আল্লাহ্ মিলালেন তাঁরই প্রতিনিধি হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ)-এর সাথে ; তা-ও আবার ঈদুল আযহিয়ার দিনে অপ্রত্যাশিতভাবে। ২০০৫ সনের কাদিয়ানের জলসায় যাওয়া সম্ভব হয়নি নানা কারণে। পড়াশোনা, দাফতরিক সমস্যা সব মিলিয়ে এক বুক হতাশা আর না-পাবার কষ্ট চেপে সহ্য করছিলাম আত্মদহন–একেবারে নিরবে। আমার কষ্টগুলো বর্ণে বর্ণে বিভক্ত হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছিল শূন্যে। সেই বর্ণকে শব্দে রূপায়ন করা আমার জন্য ছিল অসাধ্য। আর শব্দকে বাক্যে, বাক্যকে সুরে ঢালবার চিন্তাও ছিল সুদূরপরাহত। তারপরও প্রাণের মোহনায় দেখলাম বিধাতার আপন দানকে। দেখলাম তাঁরই মনোনীতের কল্যাণ প্রদায়িনী সুধা দানের অমিয় সম্ভারকে। সত্যিই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর সাথে কৃত অঙ্গীকার পুরো হয়েছে। "ইন্নি মাআকা ইয়া মাসরূর"। ঈদের আগের দিন কাদিয়ান পৌঁছাই। প্রচন্ড শীতেও এক প্রকারের উষ্ণতা ছিল মনে। ট্রেনে স্বপ্ন দেখি–হুযূর (আইঃ) জলসা শেষে স্টেজ থেকে নামছেন। হুযূর তাঁর বাম পায়ে জুতো পড়েছেন। আমাকে বলছেন। "আপনি কি পড়িয়ে দিবেন?" আমি আনন্দের অতিশয্যে হুযূরের ডান পায়ে জুতা পড়ালাম জুতা পড়াবার ছলে হুযূরের পা ছুঁয়ে দেখলাম। এমন একটা আভাস আমার মনে ছুঁয়ে গেল যে, ঘুম ভাঙ্গতেই আমি দোয়া করলাম, "হে আল্লাহ্! আমার যদি এই সফরে মৃত্যুও লেখা থাকে তবে তা হুযূরের সাথে সাক্ষাতের পরে যেন হয়।" আমার দহন-ক্ষরণ সমান চলছিল। আমি আর ভার সইতে পারছিলাম না।

ঈদের নামায হয় আহমদীয়া গ্রাউন্ডে। সকাল দশটায় ছিল নামাযের সময়। সকালে প্রচন্ড হাড়-কাঁপানো শীত উপেক্ষা করে গোসল সেরে নিলাম। নয়টা নাগাদ গিয়ে ঈদগাহে প্রথম লাইনে বসলাম। সাথে বাংলাদেশের মোরশেদ সাহেব (প্রেসিডেন্ট নোয়াখালী), ও সাইফুল ইসলাম সুমন ছিল (সুমন আমাদের অনেক ছবি তুলেছে)। যারা জলসায় কাদিয়ানে আসতে পারেনি তারা ঈদের আগে কাদিয়ান আসছিল। কবির ভাষায় বলি ঃ

"তাওয়াফে শাম্মা শো ফির আ গায়ে হে পারওয়ানে
নযর নযর মে লিয়ে দিল ও জাঁ কি নযরানে।"

দীর্ঘ প্রায় ষাট (৬০) বৎসর পর খলীফায়ে ওয়াক্ত কাদিয়ানে ঈদ করলেন। তাঁর পেছনে নামায পড়ে আমারও ইতিহাসের অংশ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করলাম। আমার মানসিক অবস্থা কি ছিল তা আমি এখানে বর্ণনা করতে অপারগ। তাই একটি ফার্সী পংক্তির মাধ্যমে বলছি–

"আয় আ-তেশে ফেরাকৎ দিলহা কাবাব কার্দাহ
সায়লাবে এশতেয়াকত জানহা খারাব কার্দাহ।"

(ওহে! তোমার বিচ্ছেদের আগুন প্রাণকে কাবাবের মত জ্বালিয়ে দিয়েছে। তোমার ভালবাসার বন্যা প্রাণকে বিরাণ করে দিয়েছে)

খলীফায়ে ওয়াক্ত যখন প্রতাপের সাথে দৃপ্ত পায়ে হেঁটে এসে দাঁড়ালেন নামাযের ময়দানে, প্রাণে মনে এক পুলক শিহরণ বয়ে যেতে লাগলো। আমার মনের সব বাসনারা একদিনে এমনভাবে পূর্ণ হবে তা ভাবতেও পারি নি কোন দিন। আমি ভাবলাম আর ভাবলাম। রহস্যের কিনারা হয়নি আজও। হুযূর নামায শেষ করলেন। যখন হুযূর খুতবা দিচ্ছিলেন আমার মনে হচ্ছিল সমস্ত জগতের চলাচল স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। অপলক নেত্রে আমি দেখছিলাম ধরা যায় অথচ অধরা এক সত্তাকে। আমার জীবনের সমস্ত সন্তাপ থেকে উৎপন্ন কষ্টের বরফ গলে হাস্যমধুর-চঞ্চল স্রোতস্বিনী হয়ে বয়ে গেল। আমি আবিষ্কার করলাম অন্য এক আমাকে। রবী ঠাকুরের মত আমারও যেন নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ হলো এক নিমিষে। জীবন আমার পেল গতি। আমি হলাম অন্যরকম অনুভবে স্নাত এক মানব।

You, who would enliven us with your
Words and songs,
Have left us without a word.
You will live in our hearts.
Memary chershed in love & affection,
Silently & forerer.

নামায শেষে সবার সাথে কোলাকুলি হল। বিশেষভাবে বলতে হয় কাদিয়ানের নাযেরে আলা সাহেবযাদা মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেবের কথা। এছাড়াও অন্যান্য নাযেরগণ ও দেশ-বিদেশ হতে আগত অভ্যাগতদের সাথে ঈদের আনন্দে শরীক হই। নামাযের পর ঈদগাহ ময়দানে সবাইকে এক প্রীতিভোজের আমন্ত্রণ জানানো হয়। আমরা সবাই খেলাম। এরপরই আমার বরাবরের অভ্যাস মত (আমি প্রতি ঈদের নামাযের পর কবরস্থানে যাই এই ভেবে যে, হয়তো আমার পরবর্তী প্রজন্ম আমাকে মৃত্যুর পরও ঈদের দিনে স্মরণ করবে)। বেহেশতি মাকবেরায় যাই। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর কবর, খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ)-এর কবরসহ জামাতের বিশিষ্ট উলামা, সাহাবী, খান্দানে মসীহে মাওউদ ও সমস্ত মুসীগণের কবর যিয়ারত করার সৌভাগ্য হয়। মনে হচ্ছিল যেন মসীহে মাওউদের সাথেই ঈদ করছি। আমি পরওয়ারদিগার রাব্বুল আলামীনের দরবারে কায়মনো বাক্যে শুধু এই দোয়াই করেছি, "হে আল্লাহ্! এই জগতে না-ই বা পারলাম পরজগতে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর সাথে মিলিত করে দিও। আমাকে এমনভাবে কল্যাণ দান কর যেন স্বপ্নে নয় বরং জাগ্রত অবস্থায় আমি তোমার মসীহকে দেখতে পাই।"

কাদিয়ানের পথে এক অন্য রকমের আবেগ। প্রত্যেকটি প্রাণে আনন্দের ধারা বইছিল চতুর্দিক থেকে। একেতো আমাদের জন্য হুযূরের উপস্থিতিই একটি ঈদ। অন্যদিকে পবিত্র ঈদুল আযহিয়া। এ যেন একেবারে সোনায় সোহাগা!

"এক গাঞ্জে পাদীদ আমদ আয্ কানে যারকুবী
যেহী সুরৎ যেহী মানী যেহী খুবি যেহী খুবি।"

(আমার সোনা চান্দি ঠুকিবার খনি হতে একটি রত্ন-ভান্ডার প্রকাশ পেয়েছে। কি সুন্দর তার সুরৎ! কি সুন্দর তার ভাব! কি সুন্দর! কি সুন্দর!) আমরা হাঁটছিলাম কাদিয়ানের অলি-গলি ধরে। এমন সময় হঠাৎ হুযূরের নিরাপত্তারক্ষীদের অবস্থান দেখে বুঝতে পারলাম হুযূর এই পথ দিয়ে যাচ্ছেন বা যাবেন। আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম। হুযূরকে সালাম দিলাম। কয়েকবার একটু উচ্চস্বরে সালাম দেবার পর হুযূর দাঁড়িয়ে গেলেন। আমার মনে হচ্ছিল সমস্ত চরাচর থমকে দাঁড়াল। আমি আমার অস্তিত্বে ছিলাম না। পৃথিবীতেই আমার জন্য জান্নাত এসে তাঁর দ্বার অবারিত করল। আমি এক দৌড়ে গিয়ে হুযূরের হাতে চুমু খেতে লাগলাম। হাতে মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আংটি দুটোতেও চুমো খেলাম। আমি আনন্দে উদ্বেলিত, হয়ে হুযূরের সাথে কোলাকুলি করলাম। পরমাত্মার প্রতিচ্ছবির ছোঁয়ায় প্রাণ সঞ্চার হয় আমার সমস্ত দেহ-মনে। ভাষা অপারগ। একমাত্র বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেই পারে এই অনুভূতি বুঝতে। হুযূর জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি নামাযে প্রথম লাইনে বসে ছিলেন না?" আমি বললাম, জ্বি। হুযূর জিজ্ঞেস করলেন, "বাংলাদেশ?" আমি বললাম, হ্যাঁ। আমি নিজে থেকে কিছুই বলতে পারছিলাম না। আমার মনে হচ্ছে আমি যেন শূন্যে ভাসছি, আমার নিজের অস্তিত্ব নিজে অনুভব করতে অপারগ ছিলাম। চোখ বন্ধ করলে আমি সেই মুহূর্তগুলো জ্বলজ্যান্ত আমার চোখের সামনে দেখতে পাই। আমার অন্তরাত্মা গেয়ে উঠে–

"হেরিতে তোমার রূপ মনোহর–
দিয়াছে এ আঁখি ওগো সুন্দর–
মিটিতে দাও হে প্রিয়তম মোর নয়নের সেই সাধ।"

হুযূর যখন আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন যে, নামাযে প্রথম সারিতে বসেছিলেন কি-না?–এই প্রশ্নটির মধ্যে আমি হুযূরের কণ্ঠে অনুভব করেছি একটি কথা। সেটি হল হুযূর বলতে চাচ্ছেন–"তোমার মনের আকুতি আমি বুঝেছি।" হুযূরের কণ্ঠ অত্যন্ত মোলায়েম অথচ "প্রণব নাথ প্রচন্ড।" হুযূরের চলাফেরা অতি বিনয়ের অথচ মনে হয় "সারা বিশ্ব ছাড়িয়ে উঠিয়াছি একা আমি বিশ্ব বিধাত্রীর।" হুযূরের হাসি নিঃশব্দ অথচ সে হাসি যেন "অনেক কথা যাও যে বলে কোন কথা নাহি বলি।" হুযূরের পোশাক খুবই সাদামাটা অথচ মনে হয় সে পোশাক যেন জোছনা আর চন্দনের ঠাঁস-বুনটে তৈরী। হুযূরের চেহারার দ্যুতি সূর্যকেও হার মানায়। সূর্যের দিকে হয়তো কোন প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে তাকানো যায় কিন্তু তাঁর দিকে তাকানোর সাহস বা মনোবল কারো নেই। তিনি এক দৃষ্টিতে একেবারে অন্তরের গভীর পর্যন্ত যেন দেখে নেন। সাধারণের মতই তাঁর চলাচল অথচ তিনি অসাধারণ! জীবনের সমস্ত সময় তাঁকে শুধু দেখতে থাকলেও শেষ মনে হবে––"মোর না মিটিতে আশা ভাঙিল খেলা।"

এরপর একে একে সমস্ত বাংলাদেশীরা হুযূরের সাথে এসে কোলাকুলি করে। ঈদ যেন এসে গেল তার নতুন আমেজ নিয়ে। হুযূর চললেন তাঁর গন্তব্যে। আমরাও যতদূর সম্ভব হুযূরের সাথে সাথে চললাম। এরপরই শুরু হয়ে যায়–কে কতক্ষণ হুযূরের সাথে ছিল তার বর্ণনার প্রতিযোগিতা। সবাই আমাকে ধন্যবাদ জানায় হুযূরকে এই ভাবে উচ্চস্বরে তিন বার সালাম দেয়ার জন্যে। কিন্তু আমি জানি হুযূরকে এভাবে উচ্চস্বরে সালাম তিন বার আমি দেইনি। কারণ আমি যদি চিন্তা করে পূর্বে থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে ডাকতাম তাহলে হুযূর দাঁড়াতেন না। এই ঘটনাটি যখন ঘটে তখন আমি আমার মধ্যে ছিলাম না। এই ঘটনাটি স্বয়ং তকদীরে এলাহী ছিল। আমার একটি স্বপ্নকে আল্লাহ্তাআলা পূরণ করেছেন মাত্র। হুযূরকে নিয়ে দেখা স্বপ্নগুলো আমি অন্য একটি লেখায় বলবো। যাই হোক, আমার জীবনের পঞ্চাশতম ঈদটি সত্যিই সুবর্ণ জয়ন্তী হয়ে থাকবে আমৃত্যু। এই ঈদের স্মৃতিগুলো কখনোই হারিয়ে যাবে না হৃদয়ের একুরিয়াম থেকে। বর্ণালী মাছগুলোর মতোই ঘুরে ফিরে বেড়াবে এখান থেকে সেখানে। যতদিন পর্যন্ত না মৃত্যু এসে বুজিয়ে দিয়ে যাবে দু'চোখ।

–মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়

উত্তরবঙ্গ রিজিওনাল ইজতেমা-২০০৫ অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে গত ১১নভেম্বর থেকে ১২ই নভেম্বর ২০০৫ইং ২ (দুই) দিন ব্যাপী উত্তরবঙ্গ মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র রিজিওনাল ইজতেমা হেলেঞ্চাকুড়ি মসজিদে অত্যন্ত সুন্দর ও সাফল্যজনকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ্‌।

এই রিজিওনের ১০টি মজলিস থেকে প্রায় ৪০জন আনসার, ৮ জন যয়ীম/যয়ীমে আলা, ২ জন জেলা নায়েম শরীক হন। কেন্দ্র থেকে মোহতারম মাহবুব আজম রেজা নায়েব সদর সফে দওম ও কায়েদ উমুমী এবং মোহতারম আব্দুর রশীদ সহ কায়েদ মাল উপস্থিত ছিলেন। ১১ই নভেম্বর জুমুআর নামাযের পর মোহতরম মাহবুব আজম রেজা সাহেবের সভাপতিত্বে ইজতেমার উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। পুরস্কার বিতরণ আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সফল সমাপ্তি হয়।

-খদ্দকার মাহবুব উল ইসলাম

দোয়ার আবেদন

মহান আলাহ্‌তাআলা আমার কানাডা প্রবাসী দ্বিতীয় মেয়ে রুশদা রাহাত করবী ও জামাতা শিকদার মোহাম্মদ নিজামকে বিগত ৩০ শে অক্টোবর (২৭ রমজান) এক ফুটফুটে কন্যা সন্তান দান করেছেন। তাঁর নাম রাখা হয়েছে নাজারা কুরবা। সে ওয়াক্‌ফে নওয়ের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর রেজিঃ নম্বর ৩০০২৯। তাঁর দাদা ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার পশ্চিম মেড্ডা নিবাসী শহীদুল্লাহ্‌ সিকদার ও নানা গাজীপুর নিবাসী এ, এফ নাজিম উদ্দীন আহমদ।

জামাতের সকল ভাই-বোনের খেদমতে দোওয়ার আবেদন করা যাচ্ছে, যেন মহান আল্লাহ্‌তাআলা তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের প্রভূত কল্যাণ দান করেন এবং তাকে তার বাবা মায়ের চোখের শীতলতার কারণ করেন।

-আমাতুল নাজিম উদ্দীন

শোক সংবাদ

❑ আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবিয়ত ও তাহরীকে জাদীদ জনাব মোহাম্মদ আবদুল জলিল-এর স্ত্রী ফাতেমা জলিল দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর গত ৮ই জানুয়ারী ২০০৬ইং রোজ রবিবার সকাল ৬.৪৫ মিঃ সাভারস্থ নিজ বাস ভবনে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। তিনি ১৯৬৮ সালে বয়াত গ্রহণ করেন। ইসলাম তথা আহমদীয়াত ও খিলাফতের প্রতি গভীর ভালবাসা রাখতেন এবং বিভিন্ন সময়ে আহমদীয়াতের বিরোধিতার সময় তিনি অটল ও অনড় থেকে মোকাবেলা করেন। বিরুদ্ধবাদীদের সকল আক্রমণাত্মক বিদ্রুপকে তিনি হাসি মুখে বরণ করে নিতেন এবং পরিবারের সদস্যদের মনোবল অটুট রাখতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতেন। পরিবারের সদস্যদের নিয়মিত নামায, চাঁদা আদায়ে এবং জামাতের কাজে ও অনুষ্ঠানাদিতে যোগদানের জন্য সর্বদা তাগিদপূর্ণ উপদেশ দিতেন। তিনি স্বামী, দু' ছেলে, চার মেয়ে, এক নাতী এবং বহু আত্মীয়-স্বজন গুণগ্রাহী রেখে যান। ৮ জানুয়ারী ঢাকাস্থ দারুত তবলীগে প্রথম জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। পরে তাঁকে দাফন করার জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামাতের কবর স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। বাদ মাগরিব দ্বিতীয়বার নামাযে জানাযার পর সেখানে তাঁকে কবর দেয়া হয়। জানাযায় ইমামতি করেন মোয়াল্লেম মাওলানা এনামুল হক রনী। জামাতের সকলের নিকট আবেদন আমার মা-এর আত্মার শান্তি এবং আল্লাহ্‌তাআলা যেন তাঁর ক্ষমার চাদরে আবৃত করে জান্নাতুল ফেরদাউসের উচ্চ মোকামে স্থান করেন এবং পরিবারের সকলকে ধৈর্য ধারণ করার তৌফীক দান করেন। আমীন

মরহুমার বড় ছেলে
শামিম আহমদ সাগর

❑ ডাঃ আবুল কাসেম গত ১০ ডিসেম্বর ২০০৫ সকাল ১০ ঘটিকার সময় ঢাকায় ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। শনিবার বকশীবাজার বাদ আসর ও নারায়ণগঞ্জে (শান্তাপুর) বাদ মাগরেব এবং বাদ এশা তারুয়াস্থ তার মা ও মামাদের পাশে দাফন করা হয়। জানাযায় বহু আহমদী ভাই ও বোনেরা শরীক হন। মৃত্যু কালে তার বয়স ছিল ৮৬ বছর। তিনি অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ছিলেন। তিনি খোদ্দাম থাকা অবস্থায় ও পরেও জামাতের অনেক খেদমত করেছেন। মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত রুগীদের সেবা করেছেন। তাকে যেন মহান আল্লাহ্‌তাআলা বেহেশ্‌ত নসীব করেন সেইজন্য জামাতের সকল ভাই ও বোনদের নিকট দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

পরিবারের পক্ষ থেকে বড় ছেলে
খালেদ বিন কাসেম, ঢাকা

❑ গত ১১/১২/২০০৫ ইং তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামাত বকশীগঞ্জ এর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জনাব ইউনুছ আলী সরকার বার্দ্ধক্য জনিত কারণে ইন্তিকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। মৃত্যুকালে ২স্ত্রী, ৬ পুত্র ও ৫ কন্যাসহ বহু নাতী নাতনী রেখে যান। তাঁর রূহের মাগফিরাতের জন্য জামাতের ভ্রাতা ও ভগ্নিগণের নিকট খাস দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

-আব্দুর রহমান সরকার

সরিষাবাড়ী জামা'তের সাবেক প্রেসিডেন্ট মরহুম মোহাম্মদ তফাজ্জল হোসেন সাহেবের তৃতীয় স্ত্রী মিসেস সারা বানু সাহেবা ৭০ বছর বয়সে গত ২০/১/২০০৫ইং শুক্রবার বেলা ১ ঘটিকায় সময় ইন্তিকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফিরাতের জন্য সকল আহমদীয়া ভ্রাতা-ভগ্নির কাছে দোয়া প্রার্থী।

মরহুমার কনিষ্ট পুত্র
-মৌলভী মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ আসাদ
মোয়াল্লেম

শুভ বিবাহ

❖ গত ১১/১১/২০০৫ ইং মোসাম্মাৎ সুলতানা রাজিয়া (সিমনি) পিতা জনাব ছোলাইমান মোলাহ্ সাং ধাক্কামারা আহমদনগর, পঞ্চগড় এর বিয়ে জনাব মাকসুদ আহমদ (রুমন) পিতা জনাব ফারুক আহমদ, কান্দিপাড়া বি-বাড়ীয়া ১৪০,০০১/- (এক লক্ষ চল্লিশ হাজার এক) টাকা মোহরানা ধার্যে সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং -৫৩৯/০৫

❖ গত ১০/০৬/২০০৫ ইং তারিখে মোসাম্মাৎ আমাতুন নূর বুশরা (শিলা) পিতা জনাব রুস্তম আহমদ গ্রাম দরগাহ বাড়ী, পোঃ রিকাবী বাজার, থানা/জেলা মুন্সিগঞ্জ এর সাথে জনাব শাহেদ কিবরিয়া অপু, পিতা মরহুম মোশাররফ হোসেন গ্রাম নুরপুর পোঃ রিকাবী বাজার থানা ও জেলা মুন্সীগঞ্জ এর বিয়ে ১,০০,০০১/- (একলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং -৫৪০/০৫

❖ গত ১৫/০৪/০৫ইং তারিখে জনাব আব্দুস ছাদেক এর কন্যা, মোসাম্মাৎ জেবুন নেছা (জান্নাত) সাং কোলদিয়া নাসেরাবাদ, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া এর সাথে জনাব আব্দুল গনি প্রামানিক এর পুত্র জনাব সাঈদুল ইসলাম (বাবু) সাং তে-বাড়ীয়া-নাটোর জামাত, এর বিয়ে ৬৬,০০০/- (ছেষট্টি হাজার) টাকা মোহরানা ধার্যে সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং- ৫১৪/০৫

❖ গত ১৮/০৩/০৫ জনাব মৃত সোহরাব হোসেন এর কন্যা, মোসাম্মাৎ মাহবুবা সুলতানা সাং বানিয়াজান, বলদিয়াআটা, ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল এর সাথে জনাব মৃত হাতেম আলী এর পুত্র জনাব হারুন-অর রশীদ সাং বানিয়াজান, বলদিয়াআটা, ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল এর বিয়ে ১,০০,০০১/-(একলক্ষ এক) টাকা মোহরানা ধার্যে সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং -৫১৫/০৫

❖ গত ০৮/০৭/০৫ জনাব নজরুল ইসলাম (দুলাল) এর কন্যা, মোসাম্মাৎআকলিমা আক্তার (লিপি) সাং কড়গ্রাম,বলদিয়া আটা, সরিষাবাড়ী, জামালপুর এর সাথে জনাব হুরমুজ আলী খাঁন এর পুত্র জনাব মোহাম্মদ আলী খাঁন সাং রন রামপুর, চকবেলতিল, জামালপুর এর বিয়ে ৪০,০০১/- (চল্লিশ হাজার এক) টাকা মোহরানা ধার্যে সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং ৫১৬/০৫

❖ গত ০১/০৪/০৫ জনাব আমীরুল আলম এর কন্যা, মোসাম্মাৎ আফসানা আক্তার (পলি) সাং উত্তর আহমদীপাড়া, বি-বাড়ীয়া এর সাথে জনাব মোঃ ফয়েজ উল্লাহ্ এর পুত্র জনাব মোহাম্মদ নবী উল্লাহ্ (নাদিম) সাং ২০৬/১ ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা ১০০০ এর বিয়ে ১,৫০,০০০/- (একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানা ধার্যে সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং,৫১৭/৫

❖ গত ১৬/১২/০৫ ইং তারিখে জনাব এ,কে, এম ফরহাদ ভুইয়া এর কন্যা, মোসাম্মাৎ ইসরাত সুলতানা ভুইয়া সাং কুটির হাট, সোনাগাজী জেলা, ফেনী এর সাথে জনাব আব্দুল হামিদ ভুইয়া এর পুত্র জনাব শান্‌জিন ইসলাম সাং থানা পোঃ কটিয়াদী জেলা কিশোরগঞ্জ এর বিয়ে ২,০০,০০১/-(দুই লক্ষ এক) টাকা মোহরানা ধার্যে সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নং ৫৩৭/০৫

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

স্থানীয় সকল জামাতের আমীর/ প্রেসিডেন্ট সাহেবগণকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে ওয়াক্‌ফে জাদীদের ৪৯তম বৎসরের ঘোষণা হুযূর (আইঃ) ৬ই জানুয়ারী' ২০০৬ জুমুআর খুতবায় ঘোষণা দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আইঃ)-এর প্রথম যুগের সাহাবাগণের উল্লেখ যোগ্য মালি কুরবানির বিভিন্ন ঘটনাবলীর বর্ণনা করে বর্তমান বিশ্বের সকল আহমদীকে ওয়াকফে জাদীদের নতুন বৎসরের ওয়াদায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন এবং বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, সকল নও-মোবাইনগণ যাতে ওয়াকফে জাদীদের মাধ্যমে মালি কুরবানীর কার্যক্রমে অংশগ্রহণ আরম্ভ করেন এবং নবাগতরা যাতে এই চাঁদার ওয়াদার বাহিরে না থাকেন।

সুতরাং আপনাদের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন, নিম্নের ছক মোতাবেক নতুন বৎসরের ওয়াদার তালিকা মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের দপ্তরে সত্বর প্রেরণে সচেষ্ট হবেন। উল্লেখ্য যে, আনসার, খোদ্দাম, লাজনার ওয়াদার তালিকা পৃথকভাবে দেখাবেন।

ক্রমিক নং, নাম, বয়স, ওয়াদার পরিমাণ, মন্তব্য

মহান আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সকলের হাফেয, নাসের ও হাদী হউন। আমীন

ওয়াসসালাম

খাকসার

শহীদুল ইসলাম বাবুল

সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

ছবি পরিচিতি ঃ সামনে দ্বিতীয় সারিতে চেয়ারে উপবিষ্ট ডান দিক থেকে (১) কফিল উদ্দিন সাহেব (২) মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব (৩) সাহেবজাদা মির্যা তাহের আহমদ [খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহেঃ)] (৪) মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব (৫) মাওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব। সামনে প্রথম সারিতে বসা অবস্থায় ডান দিক থেকে (১) মৌলভী সৈয়দ সায়ীদ আহমদ সাহেব (২) এডভোকেট গোলাম সামদানি খাদেম সাহেব (৩) জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব (৪) মৌলভী আলী আনওয়ার সাহেব (৫) মৌলভী সলিমউল্লাহ সাহেব প্রমুখ।

সূচনা রেন্ট-এ-কার
যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুন।
সালমান
৬৭৬/৩২ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা
ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে
স্বাদে ভরপুর রুচিকর খাবার
পরিবেশনে অনন্য

ধানমন্ডি রেস্তোরাঁ ১
নীচতলা
রোড নং ৪৫ প্লট ৩২/১
গুলশান ২ ঢাকা।
ফোন ঃ ৯৮৮২১২৫

ধানমন্ডি খাবার
ধানমন্ডি অর্কিড প্লাজা
(রূপা প্লাজার পার্শ্বে)
ফোন ঃ ৯১৩৬৭২২

পাক্ষিক আহ্‌মদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.
120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

খেলাফতে আহমদীয়া শত বার্ষিকী জুবিলী ২০০৮ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১। প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২। প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩। সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪। **রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন** [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।
অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫। **রাব্বানা লা তুযিগ কুলূবানা বা'দা ইয্ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্'হাব** [সূরা আলে ইমরান- ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।
অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬। **আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম** [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।
অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭। **আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে**। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।
অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)
অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯। দুরূদ শরীফ (অর্থসহ সালাত বই থেকে) প্রত্যেহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল-এর ৮-১৪ জুলাই ২০০৫ তারিখের সৌজন্যে)

হযূর (আইঃ)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সেক্রেটারী তরবিয়ত ও তাহরিকে জাদীদ
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

New Vol. No. 68 ❑ 13th & 14th Issue
Fortnightly

The AHMADI

January 31, 2006. ❑ Tk. 10.00
রেজি ঃ নং-ডি, এ-১২

দারুল আমান কাদিয়ানে খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস কর্তৃক ঈদুল আযহিয়া উযযাপন

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4, Bakshi Bazar Road,
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh.
Editor in Charge: Mahbub Hossain, National Secretary Ishaat
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925 E-mail: amgb@bol-online.com